আরো ভূতের গল্প
লীলা মজুমদার

রবীন্দ্র পুরস্কার ও ভারত সরকারের শিশু-সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তা

লীলা মজুমদার

আরো ভূতের গল্প

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮া১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

পঁচিশে বৈশাখ
১৩৮৭ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ পূর্ণিমা
১৩৮৯

প্রকাশক :
বিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
সত্য চক্রবর্তী

অলঙ্করণ :
তাপস দত্ত

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ ঃ

"কিরণ আর বরুণ নামের
আমার দুই নাতি,
ভূত দেখলে ভয় পায় না
এমনি তাদের ছাতি!
—এই বই তাদের দিলাম।"

—দিদিভাই

ভূমিকা ঃ

বলি, ভূতের গল্পের আবার ভূমিকা কিসের ? ভূমি তো মাটি আর ভূত হল গিয়ে অ-শরীরী। তা ছাড়া, যদিও এই বইয়ের সব গল্প গত তিন-চার বছরের মধ্যে ছোটদের নানান্ পত্রিকায় পকাশিত হয়েছে, তবু সব-কটি সেফ্ শোনা কথার সঙ্গে বানানো ব্যাপার মেশানো, এমন কি অনেকগুলো ঠিক শুনিওনি কস্মিনকালে ! তা সত্ত্বেও বলি, এই সব অসত্য অ-শরীরীদেরো বলবার কিছু কথা আছে। সে কথা হল—দয়া বড় ভালো জিনিস আর তার চেয়েও ভালো জিনিস হল রস নামক বস্তুটি (যদিও, সে-ও একেবারে অবাস্তব)। মেলা ভণিতা করে কি হবে, পড়েই দেখ না কি ব্যাপার।

ইতি—

লেখিকা

অহিদিদির বন্ধুরা

অহিদিদির স্বামী যখন পেন্‌শন্ নেবার পর গোরিয়া ছাড়িয়ে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে নতুন খোলা এক হাতের কাজ শেখাবার স্কুলের প্রায় মিনি-মাগনার অধ্যক্ষ হয়ে, সপরিবারে সেখানে চলে গেলেন, কেউ বলল, "পাগল" কেউ বলল "স্টুপিড্" আর বেশির ভাগ বলল, "ঠিক ওঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েছে!" পরিবার বলতে অহিদিদি আর তাঁর বুড়ি শাশুড়ি।

অবিশ্যি অজ পাড়াগাঁ ঠিক নয়, এককালে ভারি বর্ধিষ্ণু শহর ছিল বোধহয়। একটা মজা নদী গিয়ে গঙ্গায় পড়ত; নাকি মস্ত বন্দর ছিল; ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটি, বড় বড় বজরা এসে নোঙর ফেলত। মস্ত মস্ত ভাঙা ঘাট এখনো দেখা যায়। কিছুদিন আগে গ্রাম-সংস্কারক দুর্দান্ত ছেলেরা কাদা তুলতে গিয়ে মর্চে ধরা নোঙর আর অনেক মরা মানুষের কঙ্কাল তুলে, কাজ ফেলে পালিয়েছিল। অহিদিদির দেওর ধরণীবাবু বলেছিলেন কাদার নিচে নিশ্চয় মেলা ডুবো জাহাজ আছে। সরকার যদি বুদ্ধি করে এখানে হাতের কাজ শেখার ইস্কুল না করে, নদীর কাদা তোলার ব্যবসা খুলত, তাহলে তিন ডবল লোক চাকরি পেত আর সোনা-দানায় সব ব্যাটার ট্যাঁক ভরতি হত। অহিদিদির স্বামী সুরেনবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও, অহিদিদি একবার গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখে হতাশ হলেন। মজা নদীতে বর্ষাকালেও হাঁটু জল হয় না, এখন পূজোর সময় পায়ের কব্‌জি ডোবে না। তলাটা ইঁটের মতো শক্ত।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বুড়ি শাশুড়ি বেজায় খিটখিটে;

তার ওপর দুধের ফরমায়েস নিতে এসে গয়লা ফিরে গেছিল; মাছের জন্য হাটে লোক পাঠানো হয়নি; তোলা উনুন নিবে টিবে একাকার।

গুছিয়ে বসতেই দিনচারেক গেল। এ অঞ্চলটাতে বহু পুরানো পোড়ো-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ; কয়েকটার দুটো একটা মহল মেরামত করে মালিকরা বাসযোগ্য করে রেখেছে। কয়েকটা পড়ে গিয়ে ইঁটের স্তূপ হয়ে আছে; যত রাজ্যের সাপ-খোপের বাস। আর কতক-গুলো যে-কোনো সময়ে ধ্বসে পড়বে; সেদিক দিয়ে বাসিন্দাদের অদ্ভুত রকম নিশ্চিন্ত বলতে হবে। চারদিকে মস্ত মস্ত আম কাঁঠালের বাগান, যত্নের অভাবে নাকি ফল হয় না। মস্ত মস্ত পুকুর, তার পাঁক তোলা হয় না; মাছের চাইতে ব্যাঙ বেশি। একটা বেজায় পুরানো পাথরের তৈরী বিষ্ণু মন্দির, তাতে কষ্টি-পাথরের বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী। পূজুরি নেই; গয়লাপাড়ার বাসিন্দারা দু বেলা ফুল গঙ্গাজল বাতাসা দিয়ে আসে। এ দিকটাই নাকি সেকালে বড় লোক শেঠদের পাড়া ছিল। গুপ্তধন থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। গয়লারা শেঠদের দুধ জোগাত, ফাই-ফরমায়েস খাটত।

মোট কথা দিনের বেলা অত কিছু মনে না হলেও সন্ধ্যেবেলায় জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে যেত; তার ওপর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালীঘাটের সরু রাস্তাটাতে প্রত্যেকটা বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শোনা যেত। এত গায়ে গায়ে বাড়ি যে চোর ঢুকবার জায়গা ছিল না। দিনের লোকদের হট্টগোল থামলেই, রাতের লোকদের হট্টগোল শুরু হত। মাত্র দুঘণ্টার জন্য রাত দুটো থেকে চারটে একটু নিঝুম হত। এখানে সন্ধ্যা না নামতেই মাঝরাত।

সুরেনবাবু কিছু দেখেশুনে বাড়ি নেন্‌নি। যা দিয়েছে, অমনি এসে উঠেছেন। কাছে পিঠে অন্য কেউ নেই। যত রাজ্যের

পোড়ো বাড়ি আর মান্ধাতার আমলের আম-বাগান। এ-বাড়িটারো নয়-ভাগ ভেঙে এই একটা ভাগ টিকে আছে। তবে এটাকে ভালো করে মেরামত করা হয়েছে। সেকালে হয়তো এটা কোনো বড় লোকের অন্দর মহলের খানিকটা ছিল। দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনখানা শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, পাশে কল-ঘর, আর পূর্ব দিকে এই রান্নাঘর, এর মধ্যেই ভাঁড়ার ঘর। আলাদা ভাঁড়ারের কি দরকার? সব খুলে ফেলে রেখে দিলেও কেউ নেবে না। কালিঘাটে জানলার শিকের ওপর জাল দিতে হয়েছিল, নইলে আঁকশি ঢুকিয়ে পুরনো গামছা পর্যন্ত নিয়ে যেত। আর এখানে ভুলে সারারাত পেতলের ঘড়া বাইরে ফেলে রাখলেন, সকালে উঠে দেখলেন ঘড়া তো খোয়া যায় নি, বরং কিছু লাভ হয়েছে। পুরনো গন্ধরাজ লেবু গাছের মগ্ ডালের রস টুসটুসে লেবুগুলো কেমন করে খসে পড়ে আছে ঘড়ার ভিতরে।

রান্না ঘরের সামনে চওড়া রক; তারপর সান-বাঁধানো উঠোন; উঠোনের ধারে কূয়ো, লেবু-গাছ, সজনে গাছ, বেল গাছ আর রান্না-ঘরের মুখো মুখি ভাঙাচোরা গোয়াল-ঘর। সেখানে শেষ গোরু হয়তো থেকে গেছে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে। গয়লানী সকালে আড়াই সের আর এ-বেলা আধ সের ঘন লালচে সুগন্ধি দুধ দিয়ে গেছে। খিট্‌খিটে শাশুড়ি আজকাল রান্নাঘরে আসেন না; এক দিক দিয়ে সেটা কিছু মন্দ না। তিনি দু বেলা দু বাটি এক-বল্‌কা দুধ খান। সেটা আলাদা করে তুলে রাখা হয়। দু বেলার চায়ের দুধ-ও আলাদা করা হয়। বাকিটা পড়ন্ত আঁচে বসিয়ে রাখা হয়; আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়ে; সোনালী রঙ, তাতে চাঁদের গায়ের মতো ফুট্-ফুট্ দাগ। রাতে সেই সর তুলে মধ্যিখানে কাশীর বাটা চিনি ছড়িয়ে, ভাঁজ করে রাখেন অহিদিদি। শাশুড়ি এক চিলতে খান; সুরেনবাবু অর্ধেকটা মতো খান; কেউ এলে একটু খায়; কিছু বাকি থাকলে

অহিদিদি চাখেন। রান্নাঘরেরর দরজায় শিক্‌লি তোলা থাকে, জানলায় বেড়ালের ভয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষই নতুন জাল লাগিয়ে দিয়েছেন। সরটি রোজ সুগন্ধি গোল টৈ-টম্বুর হয়ে থাকে।

দুপুরের একটু মাছ তোলা থাকে। রাতে জনতা স্টোভে একটু ছক্কা করেন অহিদিদি, দুজনার জন্য খান-কতক হাত রুটি করেন, কি অল্প তেলে পরটা ভাজেন। ঘণ্টা খানেকও লাগে না। বিকেলে স্কুলের কারখানার ফোরম্যান বাবুর স্ত্রী এসে বললেন, "ওমা! ভয় করে না দিদি? গোয়াল-ঘরের পেছনের দেয়ালে তো এতখানি ফাঁক। একটা দুটো ছোট ছেলে কি রোগা-পানা মানুষ দিব্যি গলে আসতে পারে। আর আপনি কিনা দুধের সর আর রাজ্যের বাসনপত্র ছড়িয়ে রেখে, দরজায় শুধু ছিক্‌লি তুলে ও ঘরে গিয়ে রেডিও শোনেন? বলিহারি আপনাকে।"

কর্তা-গিন্নী তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। কিন্তু রাতে হ্যারিকেন জ্বেলে রান্নাঘরে গিয়ে অহিদিদি দেখলেন সরের এক পাশ থেকে খানিকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে, মেঝেতে টপ টপ করে দুধ ফেলেছে; নতুন রঙ-করা দেয়ালে ছোট ছোট আঙুল মুছেছে। অহিদিদি কাউকে কিছু না বলে, ঐ দিক থেকে একটুখানি সর কেটে ফেলে দিয়ে, বাকিটাতে চিনি ছড়ালেন। পাথরের বাটিতে তিনজনের জন্য চিনি-পাতা দৈ বসিয়ে, বাটিটা ডেকচিতে রেখে, ঢাকা দিয়ে, শিল-চাপা দিলেন। চায়ের দুধ খাবার ঘরের ডুলিতে রাখলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সকালে গিয়ে গোয়ালঘরটা দেখলেন। বাড়ি সারানোর জিনিস ছাড়া কিছু ছিল না। তবে পাশের পাঁচিলে সত্যিই খানিকটা ফাঁক। সুরেনবাবু সেইদিনই সেটা সারাবার ব্যবস্থা করলেন। সকালে জেলে-বৌ পঁচাত্তর পয়সায় এক রাশি ছোট ছোট তেল টসটসে খয়রা মাছ দিয়ে গেল। অহিদিদি সবটি তেলে

ভেজে, অর্ধেকটা দিয়ে দুপুরে চচ্চড়ি করলেন, বাকিটা রান্নাঘরের ছাদ থেকে ঝোলা শিকের ওপরে তুলে রাখলেন। সন্ধ্যাবেলায় দেখলেন, ঝাঁপি কাৎ, নিচে মেঝের ওপর দুটি মাছ পড়ে আছে, শিকেয় তোলা মাছ বেশ কম। অহিদিদি একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের দিকে চোখ গেল। গোয়ালঘরের উঠোনের দিকে দেয়াল ছিল না, খালি অহিদিদির কোমর অবধি উঁচু শক্ত একটা বাঁশের বেড়া। হঠাৎ মনে হল অন্ধকারের মধ্যে সারি সারি গোটা দশেক ছোট ছোট মাথা যেন বাঁশের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর অনেকগুলো রোগা রোগা কালো কালো হাত এ-ওকে ঠেলে সরিয়ে, নিজের জন্য জায়গা করে নেবার চেষ্টা করছে।

অহিদিদির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। আছে তাহলে ছেলেপুলে এই নির্বান্ধব পুরীতেও। কালীঘাটের বাড়িতে ছেলেপুলে ছিল না। বাড়িটা ছিল শ্মশান। অহিদিদির ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাশুড়ি কোনো ছোট ছেলের গলার আওয়াজ পেলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যেতেন। কেউ আসত না ওঁদের বাড়িতে, কেউ গল্প শুনতে চাইত না, খাবার চুরি করে খেত না। বাড়ি, না কি শ্মশান। অহিদিদি গলা তুলে ডাক দিলেন।

"কেরে আমার সর খায়, মাছ খায়?" অন্ধকারের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুপ।

অহিদিদি বললেন, "আয়। গোলাপী বাতাসা দেব, ভাজা-মশলা দেব, পরীদের দ্বীপের গল্প বলব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে তারা বাঁশের বেড়া টপকে এগিয়ে এল। আট-দশটা রোগা ছেলে ছেলেমেয়ে, গায়ে জামা নেই, রুক্ষ চুল, সাদা দাঁত বের করে ফিক্-ফিক্ করে হাসছে।

অহিদিদি গোলাপী বাতাসার কৌটো খুলে বললেন "কাছে আয়, হাত পাত!" অমনি দশটা নোংরা নোংরা হাত পাতা হল। অহিদিদি একটা করে বড় বাতাসা, একটু করে ভাজা-মশলা দিয়ে সামনেরটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর নাম কি রে?"

ছেলেটা একটু খোনা। বলল "বঁগেশ।"

"এরা বুঝি তোর দল? দ্যাখ, ও-সব খাবারদাবার-এ হাত দিস্ নে। কেউ ছুঁলে বুড়ি ঠাকুমার খাবার নষ্ট হয়। আমি রোজ তোদের খাবার দেব।"

বগেশ বলল, "কিঁ দেবে?"

"কেন, মুড়ি ল্যাবেনচুস দেব, পান দেব, কুচো নিমকি দেব, নোন্‌তা বিস্কুট দেব, আলু-নারকেল ঘুগনি দেব, কুচো-চিংড়ি ভাজা দেব। কিন্তু নিজেরা কিচ্ছুটি নিবি না, কেমন?"

বগেশ মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

অহিদিদি জনতা-স্টোভ রকে এনে, আটার নেচি কাটতে কাটতে বললেন,

"এখন খাওয়া হল তোদের, ঐখেনে বসে পড়, আমি তোদের পরীদের দ্বীপের গল্প বলি।"

ওরা যে যেখানে ছিল শান-বাঁধানো উঠোনের ওপর বসে পড়ল। অহিদিদি বললেন, "অনেক অনেক দিন আগে রমেশ বলে একটা দুষ্টু ছেলে ছিল, তার মা ছিল না, সৎমা ছিল।"

বগেশ বলল, "রঁমেশ না, বঁগেশ।"

অহিদিদি বললেন, "বেশ, তাই হবে, রমেশ না বগেশ। সৎমা বগেশকে খেতে দিত না, পরতে দিত না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটাত। শোবার জন্য খাট দিত না, রাতে বগেশ ছাগলদের সঙ্গে শুত।......"

অহিদিদি গল্প বলে চলেন আর ক্রমে ওরা কাছে এগিয়ে আসতে

থাকে। ক্রমে অহিদিদির পরটা ছক্কা রান্নাও শেষ হয়, গল্পও শেষ হয়। আগে এফটু জায়গা নিয়ে রেষারেষি, কোঁৎ কাঁৎ শব্দ হচ্ছিল, শেষের দিকে সব চুপ।

অহিদিদি গল্প শেষ করলেন, "তারপর রক্তাক্ত গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে বগেশ গিয়ে সমুদ্রেব তীরে আছড়ে পড়ল। অমনি সেই স্থঁটকো বুড়ির নৌকো এসে তীরে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির গা থেকে আলো বেরোতে লাগল, স্থঁটকো বুড়ি পরী হয়ে গেল আর মা, মা, মা বলে বগেশ তার কোলে লাফিয়ে পড়ল। তুজনকে নিয়ে নৌকো পরীদের দ্বীপে চলে গেল।"

গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েগুলো অহিদিদির পায়ের কাছে গাদা-গাদি হয়ে পড়েছিল। অহিদিদি স্টোভ নিবিয়ে, খাবার তুলে, বললেন, "আজকের মতো হল, মানিক, বুড়ি ঠাকুমার খাবার সময় হল, কাল আবার আসিস্। ঝুরিভাজা খেতে দেব আর ঘুঁটে-কুড়ুনীর রানী হবার গল্প বলব।"

এই বলে রান্নাঘরের দোরে শিকলি তুলে, এদিক ফিরে দেখলে ছেলেমেয়েগুলো নিমেষের মধ্যে ভেগেছে।

আর খাবার চুরি হত না সেদিন থেকে। আর অহিদিদি একা পড়তেন না। সন্ধ্যাবেলার ভয়-ভাবনা একেবারে দূর হয়ে গেল। কোনো চোর বা ভূত বা তুষ্টুলোক ঐ ছোঁড়াগুলোর চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। বগেশ আমসি চুষতে চুষতে বলত, "কোঁনো ব্যাটা-চ্ছেলেকে এদিকে এগুতো দেব না, মা।" অহিদিদি গল্প শেষ করে বললেন, "তোরা সব এত রোগা কেন রে? থাকিস কোথায়?" বগেশ পুরনো আম কাঁঠাল বটের বনের দিকে দেখিয়ে বলত, "ঐ হোথা মোদের আস্তানা" অহিদিদি বলতেন, "এগুলো কথা বলে না কেন? সব বোবা নাকি?" তাই শুনে সব খিলখিল করে হেসে

উঠত। বগেশ বলত, "লজ্জা পায়। জিব-কাটাদের বড় লজ্জা, মা।" অহিদিদি বললেন, "দূর ব্যাটা, যারা বড্ড কথা বলে তাদের জিব-কাটা বলে। কাল তালের বড়া করব, তালের ক্ষীর করব। খাবি তো?" তাই শুনে সব এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল! অহিদিদিও রকে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। আহা, খেতে পায় না নিশ্চয় নিশ্চয় পাতার কুঁড়েতে থাকে; মা-বাবাগুলো মানুষ না; অভাবে অনটনে—হয়তো এগুলোকে বেদম পেটায়। ওদের সুখী কর ঠাকুর।

এমনি করে প্রায় চারটে মাস কেটে গেল। সুরেনবাবুদের জন্য স্কুলের হাতায় চমৎকার নতুন কোয়ার্টার তৈরি হয়ে গেল। অহিদিদি বললেন, "ওমা, বলে কি, পৌষ-মাসে কখনো বাড়ি বদলাতে হয়? মাঘ পলে যাব।"

ছেলেপিলেগুলোর ওপর বেজায় মায়া; দিনগুলোকে ওরা দিব্যি জমিয়ে রেখেছিল। ওরা যে নতুন কোয়ার্টারে যাবে না, সে বিষয়ে অহিদিদির কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রাণ ধরে চলে যাবার কথাটা ওদের বলতে পারছিলেন না। ওদেরো নিশ্চয় কষ্ট হবে, কে খাওয়াবে কালো কালো রোগা গরীবের ছেলেদের।

পৌষ-পার্বণে অহিদিদি পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে, নারকেল-নাড়ু, দুধ-পুলি করে সবাইকে খাওয়ালেন। সুরেনবাবুর সহকর্মীরা বেজায় প্রশংসা করলেন। শাশুড়ি বারণ শুনলেন না, তিনটে পাটিসাপটা, এক বাটি দুধ-পুলি খেয়ে ফেললেন। আর সবাই চলে গেলে, সুরেনবাবুও তাস খেলতে মুকুন্দদের ওখানে গেলে, আহদিদি রান্নাঘরের রকে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "অ্যাই, বগেশ!" অমনি ফিক-ফিক করে হাসতে হাসতে দশটা ছেলেমেয়ে হাজির হল। অহিদিদি সাধ মিটিয়ে ওদের খাওয়ালেন। তার আগে ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধোয়ালেন।

খাওয়া শেষ হলে সবাইকে একটা করে পান দিয়ে অহিদিদি বললেন, "আমরা ইস্কুল পাড়ায় উঠে যাচ্ছি, জানিস্ বোধ হয় ?"

বগেশ সকলের হয়ে বলল, "হুঁ !"

"যাবিনে আমাদের নতুন বাড়িতে ?" সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়ল। অহিদিদি বললেন, "আমার দুঃখু হবে।" বলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। তাই দেখে সব কটা ফোঁচ্-ফোঁচ্ করে একটু কাঁদল। তারপর বগেশ বলল, "মোরাও থাকবনি, মা, মোরাও চলে যাব।" "কোথায় যাবি রে ? পারিস্ তো আমাদের বাড়িতে আসিস্।" খুশিতে সব মাথা দোলাতে লাগল। রান্নাঘরের শিকলি তুলে অহিদিদি ফিরে দেখেন সব পালিয়েছে। ভাবলেন আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। খুব কষ্ট হল।

পরদিন সকালে বাক্স-প্যাঁটরা, বাসনের সিন্দুক বিছানা সব নতুন বাড়িতে রওনা করে দিয়ে, সুরেনবাবুকে আর শাশুড়িকে একটা সাইকেল-রিকশাতে তুলে দিয়ে, অহিদিদি স্বামীকে এই প্রথম মিথ্যা কথা বললেন। "তোমরা এগোও, আমি গয়লা-বৌয়ের টাকা দিয়ে, তাকে সঙ্গে করে আসছি।"

সমস্ত উঠোন, গাছতলা, গোয়াল-ঘর দেখলেন ; পাঁচিল মেরামত হয়েছিল ; কিন্তু যাদের আসবার তারা ঠিকই পাঁচিল টপকে আসত। অহিদিদি আমবনে ঢুকে অনেকখানি ঘুরে এলেন, কোথাও কোনো কুঁড়েঘর কি বস্তি দেখতে পেলেন না। তখন তাদের আরেকবার দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে, একটা রিক্শা নিয়ে নতুন কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

এর দু-মাস পরে, ছোট মেয়ে-জামাই ত্রিবাঙ্কুরে বদলি হল, নাতি-নাতনিকে অনেক দিনের জন্য অহিদিদির কাছে রেখে গেল। তখন একদিন গয়লা-বৌ হঠাৎ বলে বসল।

"এবার নতুন বাড়িতে উঠে এসেছ, এখন বললে দোষ নেই।

কি করে পাঁচ মাস ঐ হানা-বাড়িতে বাস করলে মা, ভেবে পাইনে। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকরা ও তল্লাটে যায় না, জিব-কাটাদের ভয়ে। তোমরা কিছু দেখনি?"

অহিদিদি কাঠ হলেন। শাশুড়ি বললেন, "কি বলছ বৌ? জিব-কাটা আবার কি? আমরা কাউকে দেখিটেখিনি। কে ওরা?"

"ওমা! শোননি ঠাকুমা? ঐ বাড়িটা ছিল এক মস্ত সদাগরের। একবার ভোরবেলায় গয়লাদের ছেলে-মেয়েরা পৌষ-পার্বণের বাসি পিঠে খেতে এসে এমনি হট্টগোল করেছিল যে কর্তা তাদের ন'জনের জিব কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়টা পালিয়েছিল।

সে-ও আজ দু-শো বছরের কথা হবে। গয়লা-পাড়ায় আমরা আজ-ও তাই নিয়ে দুঃখু করি। তারপর থেকে নাকি আম-বাগানে আর বোল ধরে না আর আশ্চর্যের কথা কি জান মা, এক্ষুনি দেখে এলাম গাছে গাছে মুকুল এসেছে। যাই, মা। এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পূজো দিই।"

লক্ষ্মী

বোর্ডিং-এর মাসিমা মাখনের কৌটো, জ্যামের শিশি, সব জালের আলমারিতে বন্ধ করে বললেন, "লক্ষ্মী বড় দুষ্টু মেয়ে। কেউ এসে খাবার টেবিলে বসবার আগেই, কোথাকার এক পাতি বেড়ালকে অর্ধেক মাখন জ্যাম খাইয়ে দিয়েছে। কেন ?"

লক্ষ্মী বলল, ওর যে খিদে পেয়েছিল, ম্যাও-ম্যাও করে কাঁদছিল।"

মাসিমা রেগেমেগে বললেন, "তাহলে বেড়াল নিয়ে আজ তুমি আমার স্নানের ঘরে বন্ধ থাক। আমরা সকলে ঝরনাতলায় চড়িভাতি করতে যাচ্ছি।"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল, সে আর কি বলব। তারপর যখন মণি, ফেনি, ললিতা, বুলু, এমন কি বোকা মুকুল পর্যন্ত মাসিমার সঙ্গে ঝরনা-তলায় যাবার জোগাড় করতে লেগে গেল, লক্ষ্মীর মুখে কথা সরে না।

হিংসুটি মালতী একটা টফির বাক্সে শুকনো পাঁউরুটি আর এক বোতল জল স্নানের ঘরের তাকের ওপর রেখে, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসতে হাসতে বলল, "এই রইল তোমার খাবার। আমরা লুচি, কপিভাজা, আলুর দম আর ক্ষীরের সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি।" তখন তার চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে দুবার মাথা ঠুকে দিয়ে, ঠেলে দরজার বাইরে বের করে না দিয়ে লক্ষ্মী করে কি ?

মালতীটা এমনি ছিঁচকাঁদুনে যে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে করতে অমনি চলল নালিশ করতে।

লক্ষ্মী স্নানের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটা জল-চৌকিতে ভাবতে বসল। ভুলে জানলা বন্ধ করেনি, সেখান দিয়ে বড় মেয়ে অনুদিদি যেই না মুখ বাড়িয়ে বলতে শুরু করেছে, "ছিঃ! তোমার কি লজ্জাও নেই! কিন্তু মাসিমা বলেছেন আর যদি কখনো এমন খারাপ কাজ না কর, তাহলে তোমাকে ক্ষমা—"এই অবধি বলে আর কিছু বলা হল না, কারণ টবের হাতলে একটা বড় মাকড়সা বসেছিল, লক্ষ্মী সেটাকে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে অনুদির মুখে ছুঁড়ে মারল।

অনুদি আঁউ-আঁউ করতে করতে দৌড়ে পালাল। লক্ষ্মী জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে, তাক-ঢাকা কাগজ পাকিয়ে নল বানিয়ে. নলের মাথা ভিজিয়ে সাবানের গায়ে ঘষে, রাশি রাশি ছোট ছোট বুদ্বুদ ওড়াতে লাগল।

দেখতে দেখতে ঘরময় সাবান-জলের ফোঁটা পড়ে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেল। তাছাড়া আর বুদ্বুদ ওড়াতে ভাল লাগছিল না। লক্ষ্মী দু-হাত কনুই অবধি ডুবিয়ে জল ঘাঁটতে বসে গেল, কাপড় চোপড় ভিজে চুপ্পুড়।

যাবার আগে মাসিমা নিজে এসে দরজায় ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন, "দরজা খোল, লক্ষ্মীটি, সত্যি কি আর তোমাকে ফেলে যেতে পারি আমরা। ঐ একটু শিক্ষা দিলাম। চল, আমরা এবার রওনা হব।"

লক্ষ্মী জানলাটা একটু ফাঁক করে মাসিমাকে কাঁচকলা দেখাল। মাসিমার নরম ফরসা গালটা রাগের চোটে লাল শক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, বেশ ত থাক ওখানে!"

বলে বাইরে থেকে দরজা-জানলার শিকলি তুলে দিয়ে হুম্ হুম্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। একটু পরেই বাইরে ওদের কলকল শব্দ শোনা গেল। সবাই রওনা হয়ে গেল, চৌকিদারের

ছেলে সাঁইলা ওদের খাবারদাবার নিয়ে চলল। জানলা ফাঁক করে লক্ষ্মী সব দেখল।

ওরা সত্যি সত্যি চলে গেলে পর বোর্ডিং-বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। সে কি ভয়ঙ্কর চুপচাপ যে ভাবা যায় না, কানের মধ্যে কি রকম ঝিম-ঝিম শব্দ হতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি, কড়ি বরগা থেকে মট্-মট্ আওয়াজ শোনা গেল।

চৌকিদার, মালী, এদের ঘর অনেক দূরে, ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না। জ্যেঠি বলে যে বুড়ি ওদের রান্নাবান্না করত, সে-ও এ বেলার মতো কজে সেরে নিশ্চয় নিজের ঘরে চলে যাবে। তিনটের আগে তার টিকির ডগা দেখা যাবে না। চারটের সময় চড়িভাতি-ওয়ালীরা ফিরবার আগে চা জলখাবার বানাবে। লক্ষ্মীর কথা হয়তো তার মনেও থাকবে না।

রেগে গিয়ে লক্ষ্মী মাসিমার চুল কালো করার ওষুধের শিশি থেকে সব ওষুধটা নর্দমায় ঢেলে দিয়ে, শিশিটা টবের পিছনে লুকিয়ে রাখল। বুঝুক মাসিমা খারাপ ব্যবহার করার ফল।

টবের পিছনের দেওয়ালটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। রঙটাতে কেমন ছোপ ধরে, বিকট সব মুখ হয়ে আছে। এই বাড়িটাই একটু অদ্ভুত, আগে নাকি এখানে এক চা-বাগানের সায়েব থাকত, তার স্ত্রীরা সবাই মরে যেত। তার পর থেকে রাতে কি সব আওয়াজ হত, বড় বাড়িতে চাকর-বাকররা শুতে চাইত না। এ-সব জ্যেঠির মুখে শোনা। শেষটা টিকতে না পেরে বাড়িটা বাস্তু-বিভাগকে দান করে সায়েব বিলেত চলে গেল। সে-ও প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

সেই ইস্তক বাড়ি খালি পড়ে ছিল। পয়সা দিলেও কেউ থাকত না। জ্যেঠিকে একশো টাকা দিলেও রাত দশটার পর সে এ-বাড়িতে থাকতে রাজি নয়। দশ বছর আগে বাড়ি মেরামত করে, সাজিয়ে-গুজিয়ে, এই সরকারী স্কুল হয়েছে। একজন মোটা মন্ত্রী নিজে এসে

লাল রেশমী ফিতে কেটে ইস্কুল খুলে দিয়েছিলেন। বড়লোকরা ভালো কাপড়-চোপড় পরে, হাত-তালি দিয়েছিলেন। নতুন চৌকিদাররা মুরগি বলি দিয়ে, দেওয়ের পূজো দিয়েছিল। হুঁঃ। তাতে তো ভারি ফল হল। যাক গে জ্যেঠি এ নিয়ে কিছু বলতে চায় না। এক্ষুনি মাসিমা আসবেন।

বেড়ালটাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ছিল, এই নেই। ঘরের দরজা-জানলা তো বন্ধ, তাহলে সে গেল কোথায়। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে লক্ষ্মী স্নানের ঘরের বাইরের জানলাটা খুলে চারদিকে দেখতে লাগল। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে জ্যেঠি বেরিয়ে এসে, দরজা বন্ধ করে, এই বড় একটা তালা লাগিয়ে দিল। তারপর দোতলায় লক্ষ্মীর দিকে চোখ পড়তেই, ঠোঁট কুঁচকে বলল, "নাও এবার বোঝ ঠেলা! রোজ রোজ আমার দুধের সব ছিঁড়ে খাওয়া, ময়লা আঙুলে ময়দা ঘাঁটা, কলের জল খুলে রাখা, এবার বেরুচ্ছে সব!"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল যে শুধু জিব ভ্যাংচানো ছাড়া কিছু করতেই পারল না। কারণ ও-সব ও মোটেই করেনি। কিন্তু যে করেছে সে বেশ করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে, লক্ষ্মী খুব খুশি হয়েছে। জ্যেঠি খোবামি গাছের তলা দিয়ে ঘুরে সামনের গেটের দিকে চলে গেল।

লক্ষ্মী বাইরে চেয়ে রইল। নীল আকাশের ওপর বরফের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে আঁকা। রান্নাঘরের পেছনে রাস্তা বেজায় পিছল। তার ওপারে ছোট্ট একটা ঝরনা, অনেক ওপর থেকে পড়ছে। কান খাড়া করলে তার ঝর-ঝর শব্দ শোনা যায়। ওর নাম নাকি "মণি-ঝোরা"। জ্যেঠি বলে মনে পাপ থাকলে মণি-ঝোরার জল খেলেই পেট কামড়ায়।

মণি-ঝোরার দিকে যাওয়া বারণ। অনেক বছর আগে প্রকাণ্ড

ধ্বস নেমে মণি-ঝোরার ও-পারের পাহাড়ের গা খসে, বাড়ি-ঘর লোকজন নিয়ে, একেবারে নিচে, সেই সোনোরি-চঙে পড়ে গেছিল। আগে ওখানে নাকি খুব ভালো একটা ফলের বাগান ছিল, মস্ত একটা বাড়ি ছিল, সেখানে দুষ্টু মেয়েদের ভালো হতে শেখানো হত। মাসিমা একদিন বলেছিলেন সেটা এখন থাকলে লক্ষ্মীকে ভরতি করে দিতেন। ভেবেও এমনি রাগ হল লক্ষ্মীর যে মাসিমার সুগন্ধি সাবানটা টবের জলে ফেলে দিয়ে, গোলাপ-এসেন্সের তেলটার অর্ধেক নিজের মাথায় আর পায়ে মেখে ফেলল।

তারপর আবার জলচৌকিতে বসে রইল। হঠাৎ কানে এল বাইরে ধুপধাপ, কল-কল শব্দ। এ আবার কি? অমনি জানালার কাছে গিয়ে দেখে কি না আজ ছুটির দিন একপাল মেয়ে এসে স্কুল-বাড়ির বাগানে ঢুকেছে। নিশ্চয় পেছনের কাঠের গেট দিয়ে। সামনের দিকে তো চৌকিদারের ঘর। ওদের দেখেই লক্ষ্মীর মনটা খুশি হয়ে উঠে। মেয়েগুলোর সব কটার দুটো করে বেণী বাঁধা, গায়ে গাঢ় নীল জামা-পরা এই শীতের দেশেও খালি পা। কিন্তু কি দুষ্টু, কি দুষ্টু! এসেই মাসিমার শাকের গাছ মাড়িয়ে, গাঁদাফুল গাছ উপড়ে, তর্‌তর্‌ করে গাছে চড়ে কাঁচা খোবানি ছিড়ে, সে যে কি অসভ্যতা আরম্ভ করে দিল দেখে লক্ষ্মীর চুল খাড়া।

শেষটা আর থাকতে না পেরে ওপর থেকে ডেকে বলল, "অ্যাই অসভ্য মেয়েরা! আমাদের বোর্ডিং-এ এসে কি লাগিয়েছিস্? পালা বলছি।"

তাই শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে তারা হেসেই কুটোপাটি! "কেন, মারবি নাকি? তাহলে অত বোলচাল না ঝেড়ে নেমে এসে মার না।" এই বলে ভেংচি কেটে, বক দেখিয়ে এক পায়ে নেচে, দু'কানে দুই বুড়ো আঙুল পুরে আঙুল নেড়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধাল।

স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যে কটা উঠে আসছিল,

লক্ষ্মী তাদের গায়ে এক মগ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। তারা যে কি খারাপ কথা বলতে লাগল সে ভাবা যায় না! তারপর টপটপ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে বৃষ্টির জল যাবার পাইপ ধরে ঝুলতে লাগল!

লক্ষ্মী বলল, "আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

মেয়েগুলো থমকে থেমে গেল। "ঘরে বন্ধ? ছুটির দিনে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে! কি খারাপ! কি খারাপ! দাঁড়াও এক্ষুনি খুলে দিচ্ছি।" এই বলে পাইপ থেকে দোল খেয়ে দুটো রোগা মেয়ে স্নানের ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। লক্ষ্মী একেবারে হাঁ! পকেট থেকে পুরনো একটা চাবি বের করে, কাঠের সিঁড়ির মাথায় স্নানের ঘরের বন্ধ দরজায় মাসিমা যে তালা লাগিয়ে গেছিলেন, সেটাকে কট্ করে খুলে ফেলল।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলল, "ও কি রকম চাবি ভাই, বিলিতী তালাও খোলে?" ওরা খিল খিল করে হেসে বলল, "সব তালা খোলে এই চাবি দিয়ে। তোমাদের রান্না ঘরের তালাও!"

লক্ষ্মী যেন আকাশ থেকে পড়ল, "তোমরাই তাহলে জ্যেঠির সব ছেঁড়ো, ময়দা ছড়াও?"

ওরা বেজায় হাসতে লাগল, "তাছাড়া উনুনে জল ঢেলে রাখি, মুরগি ছেড়ে দিই, দুধে তেঁতুল ফেলি, আরো কত কি করি।"

লক্ষ্মী একটু গম্ভীর হয়ে গেল, "কোথায় থাক তোমরা?"

ওরা বলল, "কেন আমাদের ইস্কুলে। মণি-ঝোরার ওপারে।"

লক্ষ্মী বলল, "দেখেছ, মাসিমা কি খারাপ! বলে নাকি ওদিকে যেও না, ওদিকে কিচ্ছু নেই।"

মেয়েগুলো এ-ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কিছু নেই তো, তুমি দেখবে চল।"

তাই নিয়ে গেল ওরা পেছনের পিছল রাস্তা দিয়ে, মণি-ঝোরার ঝরনার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে নিল। তারপর খাড়া খানিকটা পাহাড় বেয়ে উঠল। সেখানে ঝোপে ঝাড়ে, থোপা-থোপা লাল কালো বেরি হয়েছিল। কি মিষ্টি, কি মিষ্টি! একটাতেও পোকা নেই। তাই শুনে মেয়েগুলো কি খুশি! "ঠিক তাই! একটা খারাপ জিনিস পাবে না আমাদের ইস্কুলে।"

বাস্তবিকই তাই। চারদিকে ফুল-ফলের বাগান ফুট ফুট করছে। গাছে গাছে পাকা কমলা, কলা, আপেল, ঝোপেঝাপে লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে গোলাপ ফুল। মস্ত লম্বা একটা একহারা বাড়ি। তার সব দরজা-জানলা খোলা।

ঘরের মধ্যে তাকের ওপর সারি সারি ছবির বই, গল্পের বই, বোয়ম-বোঝাই লজঞ্চুস, টফি, ভাজা মশলা, কুলের আচার, চীনে-বাদামের তক্তি, আম-সত্ত্ব। যার যত খুশি নাও আর খাও।

চারদিকে কত কুকুর, কত বেড়াল, কত ছাগলছানা, কত মুরগির বাচ্চা। কেউ বন্ধ নেই, সবাই ছাড়া। তাদের মধ্যে সে পাতি বেড়ালটাও ছিল।

লক্ষ্মী একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমরা মণি-ঝোরার জল খেলাম, পেট-ব্যথা করবে না?" ওরা বলল, "দূর বোকা! ব্যথা তো থাকে পেটে, জলে থাকবে কেন?" তাইতো, এ-কথা তো লক্ষ্মীর আগে মনে হয়নি।

লক্ষ্মী তখন বলল, "তোমরা বড় ভালো, তোমাদের নাম কি ভাই?" ওরা বলল, "আমরা তোমার বন্ধু।"

বলে তরতর করে এক গাছে উঠে, ডাল ধরে ঝুলে আরেক গাছ দিয়ে নামল। ওরা নাকি খিদে পেলেই খায় আর ঘুম পেলেই ঘুমোয়।

লক্ষ্মী বলল, "তাহলে পড় কখন?" ওরা হেসেই কুটোপাটি, "কি যে বল! দুষ্টু মেয়েরা আবার পড়ে নাকি? যে বইতে ছবি নেই, সে-বই আমরা পড়ি না। আর যে বইতে ছবি আছে সে-বই তো পড়ার বই নয়। তবে আর পোড়াশুনোর কথা কেন বল!" এই বলে দৌড়, দৌড়, দৌড়। যাদের সাহস বেশি তারা মণি-ঝোরার জলের ধারা বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে যেতে লাগল, আবার জলের ধারের রডোডেনড্রন গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফিরে এল।

শেষটা কখন যে বিকেল হয়ে এল লক্ষ্মীর খেয়াল নেই। যেই না গুম্ফার লামা ঘণ্টা পিটল, অমনি লক্ষ্মী লাফিয়ে উঠল, এই রে! চারটে বাজে যে! মাসিমারা এক্ষুনি ফিরবেন!

ওরা সবাই হাসতে হাসতে ওকে হাত ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বোর্ডিং-এর মাসিমার স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ির ওপরে পৌঁছে দিয়ে বলল, "তুমি একটু বস! আমরা সব সাফ করে দিই।" এই বলে তারা স্নানের ঘরে ঢুকে গেল।

লক্ষ্মী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাসিমার ডাকে ওর ঘুম ভাঙল। মাসিমা কাঠের সিঁড়িতে ওর পাশে বসে পড়ে, ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "ও মা! কোথায় যাব! একলা একলা সারাদিন কাটল, এখন সিঁড়ির মাথায় বেড়ালকোলে ঘুমিয়ে রইলি। যদি গড়িয়ে পড়ে যেতিস্?"

লক্ষ্মী বলল, "ওরা ধরে ফেলত।" মাসিমা হেসে বললেন, "কারা ধরত রে? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? চল, মাংসের সিঙ্গাড়া কিনে এনেছি। সারাদিন কিছু খায় নি, আহা রে যাই! স্নানের ঘরে তালা দিতে ভুলে গেছিলাম নিশ্চয়ই, পালিয়ে যাসনি যে বড়?"

বেড়ালটা বলল 'মিউ'। অর্থাৎ, পালিয়ে গেছলি বৈকি!

স্নানের ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার ঝকঝক করছিল। যেটি যেমন

ছিল ঠিক তেমনটি আছে। তাকের ওপর চুল-কালো-করার-ওষুধের শিশিটাও। মাসিমা জল গরম করে ওর হাত মুখ ধোয়ালেন। বললেন, "কি জানি, চোখটা কেমন চক-চক করছে, জ্বরটর আসবে না তো। তুই বরং শুয়ে থাক, আমি তোর লুচি, কপিভাজা, আলুর দম, ক্ষীরের সন্দেশ রেখে গেছিলাম যে। শিকলি তো লাগাইনি, ডুলিতে দেখলি না কেন?"

আরো পরে জ্যেঠি খাবার নিয়ে এসে, ওর থুতনির নিচে আঙুল রেখে, চোখের দিকে চেয়ে বলল, "জ্বর না আরো কিছু। তুমি মণি-ঝোরার জল খেয়েছ, এবার থেকে তুমি যা নেই তাই দেখবে।"

কাঠপুতলি

ছোটবেলায় মাঝে মাঝে পুরী যেতাম। সমুদ্রের ধারে থাকতাম, দেখতাম ভোরে যে-সব নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরুত, বেলা বারোটার পর তারা ফিরত। ফিরেই নৌকো টেনে বালির উপর তুলে, জাল নামিয়ে উপুড় করে ফেলত। অমনি ঢিপি হয়ে পড়ত চেনা-অচেনা কত রকম মাছ। কতকগুলো ঠিক মাছ-ও নয়, সমুদ্রের গুগলী, আর মাছ, শামুক এই সব। মাটিতে পড়ে সেগুলো চিক-চিক কিল-বিল করত আর আমরা অমনি দেখতে ছুটতাম। বড়রা চ্যাঁচামেচি করতেন, "এই সমুদ্রে চান করে এস। রান্না হয়ে গেছে, এক্ষুনি খাবার দেবে, আবার ঐ দেখ সব রোদ্দুরে মাছ দেখতে ছুটল।" তা কে কার কথা শোনে।

অদ্ভুত সব মাছ; শুঁড়-ওয়ালা গোল মাছ, দাঁড়-ওয়ালা করাত-মাছ, তেলচুকচুকে সার্ভিন মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এই সব মাছ বাজারে বিক্রি হত। এ ছাড়াও ধরা পড়ত ছোট ছোট হাঙরের বাচ্চা, তাদের নিচের মাড়িতে দুসারি করে দাঁত। ছোট ছোট অক্টোপাস্, আটটা ঠ্যাং মেলে কিল-বিল করত। এ-সব ওরা আলাদা করে রাখত।

সমুদ্রের পাড়ি যেখানে খুব উঁচু সেখানে জেলেদের ঘর্। তালের পাতা দিয়ে বোনা গোল গোল ঘর। ঘরের বাইরে ছোট একটা পাথরের কিংবা ইঁটের ঢিবি; তার ওপর রাতে ওরা আলো দিত। এক থুরথুরে বুড়ো জেলে এসে রোজ দাঁড়াত। তাকে সবাই উনো বলে ডাকত।
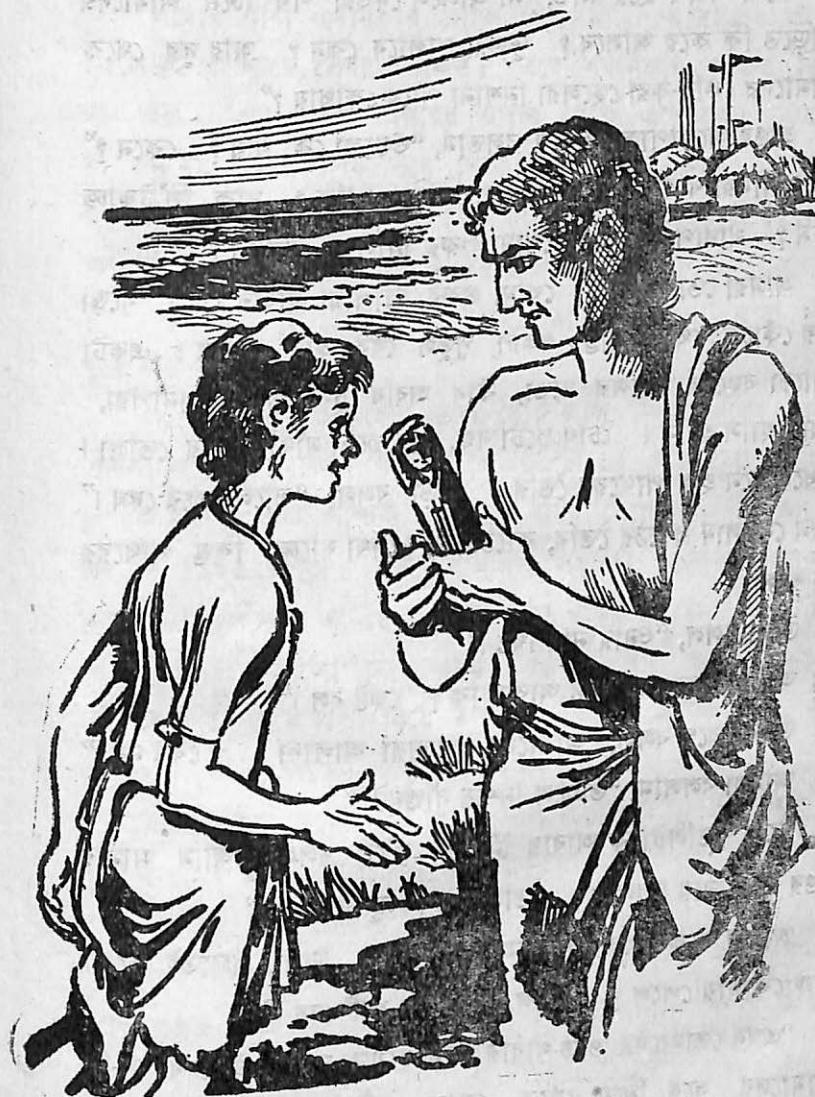
শুনিনি? পাকা ভুরুর তলা থেকে চকচকে চোখে তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'তাহলে চল আমার সঙ্গে।' কোঁচড়ে করে ঝিনুকা নিয়ে বাবা তার সঙ্গে গেল।

বাবা দেখল, সমুদ্রের বালির ওপর ছোট জেলেদের গ্রাম। গোল-পাতার ঘর, মাটির দেয়াল দিয়ে বালি ঠেকিয়ে কুমড়ো করেছে, তরমুজ করেছে। ঝেঁটিয়ে-পেটিয়ে সাফ করে রেখেছে। বেলগাছের তলায় কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশটা কালো কালো ছেলে-মেয়ে, হাত জোড় করে, আকাশে চোখ তুলে, সরু গলায় গান গাইছে। বাবা বলল, "ওরা কি করছে?"

বুড়ো বলল, "দেবতার নামগান করছে। খিষ্টর পূজো করছে।" বাবা তো অবাক? 'ঠাকুর নেই, পাথর নেই, পূজো করছে কার?'

এমন সময় ঘর থেকে থোমা-গুরু বেরিয়ে এল। ছেঁড়া কাপড়-পরা, খালি পা, লাল মুখ। বাবা হাঁ করে দেখল, গান শেষ হলে ঝুড়ি থেকে রুটি নিয়ে সবাই ভাগ করে খেল। বাবাকে দিতে গেল, বাবা নেয় না। ছুড়ে ফেলে, বাবা ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

অনেক দূর গিয়ে একটা টিলার নিচে পড়ল আবার থোমার সামনে। থোমা জেলেদের ভাষায় বলল, "নিলে না কেন? খিষ্টর দেওয়া রুটির মতো কি আছে?"

বাবা বলল, "আমরা গরীব লোক, শুঁটকি খাই, ওসব আমাদের নিতে নেই।"

থোমা হাসল। তাই শুনে বাবার মনটাও খুশি হয়ে গেল। থোমা বলল, "খিষ্ট-ও তো গরীব ছিল। তার বাবা ছুতোর মিস্ত্রী। সে গরীবদের কাছে ডাকত। তুই আয় আমার কাছে।" পায়ে পায়ে বাবা এগিয়ে গিয়ে ছিনুকটা থোমার পায়ের কাছে রেখে বলল, "এটা তোমাদেরই। জেলের কাছ থেকে না বলে নিয়েছিলাম।

"কেন নিয়েছিলি?"

"ওতে মুক্তো থাকে। একটা মুক্তো বেচলে আমাদের ছয় মাসের খাবার হয়। এখানে সবাই ঐ রকম ঝিনুক খোঁজে।"

তবে ফিরিয়ে দিচ্ছিস কেন?'

'গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের খাবার কিনে দেবে বলে।'

থোমার হাতে ভিক্ষার ঝুলি।

ঝিনুকটা ঝুলিতে ভরে, ঝুলির মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা কাঠ-পুতলি বের করে থোমা বলল, "এই নাও খিষ্টর পুত্‌লি। মুক্তোর চেয়েও ঢের বেশি এর দাম। এ ঘরে থাকলে আর কোনো ভয় থাকে না।"

বাবা নিল না সেটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভয়ে ছুটে পালাল। মিশন স্কুলে মাস্টারের বাড়িতে বাবা কুয়োর জল তুলত। পরদিন তাঁকে বলল, 'থোমা কে?'

মাস্টার তো, অবাক। থোমা, তার নাম কোথায় শুনলি? তার মতো মহাপুরুষ আর কোথায় পাব রে? ইংরেজরা আসবার আগে সে এসেছিল, গরীবরা ছিল তাঁর প্রাণ। তার নামে মন্দির আছে। ঐ টিলার ওপর শত্রুরা তাকে মেরে ফেলেছিল। ভালো লোকদের তো আর কেউ বাঁচতে দেয় না। সে বড় ভালো লোক ছিল রে!"

বাবা সেই টিলার নিচে খুঁজে দেখল, যদি কিছু পায়। বালি সরিয়ে, কাঠপুতলিটাকে আবার পেল। বদলে গেছে। কাঠ ছিল, পাথর হয়েছে। সেই চেহারা। একটা ছেলে কাঁধ অবধি চুল, জোববা গায়, হাত দুটি মাথার ওপর তোলা। খিষ্ট। কিন্তু থোমার সেই গাঁ-টাকে আর খুঁজে পেল না। সমুদ্রের ধারে সেই ছেলেকেও দেখল না।

আর বাড়ি গেল না বাবা। থোমা বলেছিল, খিষ্ট থাকলে কোন ভয় থাকে না।' খিষ্টকে কোমরে গুঁজে সমুদ্রের ধারে হেঁটে হেঁটে দশ বছর পরে বাবা এইখানে এসে পৌঁছেছিল। ততদিনে

ডুবুরির কাজ তার শেখা হয়ে গেছিল, আর তার কোনো কষ্ট রইল না। ১০০ বছর বেঁচেছিল আমার বাবা। আমাদের ঠাকুর দেবতারা ঘরে থাকে, খিষ্ট থাকে দোরের মাথায়! বাড়ি থেকে বেরুলে ওকে সঙ্গে আনি। আর আমার কোনো ভয় থাকে না। গল্প শেষ করে উনোকে উঠে পড়তে দেখে, আমরা ওকে পয়সা দিতে গেলাম। ও রেগে পয়সা ঝেড়ে ফেলে দিল।

আমরা বললাম, "দেখি আরেকবার তোমার খিষ্টকে।" দাদা কাঠপুতলিটাকে ভালো করে দেখে বলল, "এ নিশ্চয় যীশুখৃষ্ট, খৃশ্চানদের দেবতা। "দিদি বলল, "কিংবা শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দুদের দেবতা। বৃন্দাবনে মাঘ মাসে বেজায় শীত পড়ে, তাই জেব্বা পরেছে।"

উনো আমাদের হাত থেকে কাঠ-পুতলিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল "ওকে আমি চিনি না? ও খৃশ্চানদের যীশুও নয়, হিন্দুদের কেষ্ট, নয়। ও হল গিয়ে পৃথিবীর সব গরীব দুঃখীদের খিষ্ট। তোমরা ওকে কি করে জানবে!"

এই বলে উনো হন্ হন্ করে চলে গেল।

ফ্যাণ্টাষ্টিক

আমার ছোটমামা প্রায় আমারি সমবয়সী। বেজায় বাস্তববাদী কল্পনা-টল্পনার বালাই নেই, অলৌকিকে বিশ্বাস নেই। ভীষণ খেতেটেতে ভালোবাসে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সক্কলের সঙ্গে গলাগলি ভাব। এমনকি সম্পূর্ণ অচেনা লোকেরাও যে কেন ওকে এত পছন্দ করে, কেউ ভেবে পায় না। মোটা, বেঁটে, মাথায় দুপাশে টাক, মধ্যি-খানের চুল আধ-পাকা, অসমান দাঁতগুলো পান খেয়ে খেয়ে লালচে, ছোট ছোট চোখ সব সময় আনন্দে মিট মিট করছে। কিসের এত আনন্দ তাও বোঝা যায় না ছাই। বৌ বেজায় খিটখিটে, একটা ছেলে দিল্লীতে চাকরী করে, পূজোর সময় একটা করে চিঠি লেখে। একটা মেয়ে, তারা বেজায় ফ্যাশানেবল, ছোট খামার বাড়িতে খাবার টেবিলে লাল লিনো পাতা দেখে নাক সিঁটকায় আর বলে "পূজোর সময় যেন আবার আমার জন্যে তুমি কাপড় পছন্দ করতে যেও না বাবা, শেষটা কাকে দান করব ভেবে পাব না।" তার ওপর মামার কুকুর পোষার শখ, সে মামী কিছুতেই দেবে না। কুকুরের লোম খেলে নাকি ক্যান্সার হয় আর কুকুর চাটলে কিডনিতে পোকা হয়। ছোট মামা তাই অন্য লোকের বাড়ির কুকুরের গায়ে হাত বোলায় আর নেড়িকুত্তারা যখন ওর পা চাটে, আহ্লাদে ওর দু-চোখ বুজে যায়।

একটা নাতি একটা নাতনী। কিন্তু দিল্লী থেকে বৌমা কখনো চিঠি লিখে যেতে বলে না। ওদের নাকি দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে। নাতিনাতনীর জন্য একবার ছেলের হাতে কটকের কাঠের

খেলনা পাঠিয়েছিল ছোটমামা, মামী যদিও বারণ করেছিল। পরের বার অফিসের কাজে আবার যখন ছেলে এল, খেলনা ফিরিয়ে আনল! বৌমা বলেছে ওসব রঙে নাকি বিষ থাকে, কক্ষনও কিনবে না। এইবার গরমের সময়ে দক্ষিণাবাবুদের সঙ্গে দার্জিলিং গেল ছোটমামা, খেলনাগুলো সঙ্গে নিয়ে। সেখানে একবার দেখে গেছিল সুতোর কাটিম নিয়ে রাস্তার নেপালী ছেলেরা খেলা করছে। তারা নালার জল খায়, রঙিন খেলনায় তাদের নিশ্চয় কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া খেলনাগুলোকে আমি আচ্ছা করে ঘষে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম, এতটুকুও রঙ ওঠেনি। বৌটা যেন কি?

দক্ষিণাবাবু ছোটমামার অফিসে কাজ করতেন; এখন কেবলি নানান্ ছিচকে রোগে ভোগেন। ছোটমামার পেয়ারের বন্ধু; এক সময় প্রত্যেক শনি-রবিবার তাস খেলতেন; এখন হয়ে ওঠে না। পেনসন নেবার পর ছোট্ট বাড়িতে উঠে গেছেন, সেখানে তাসখেলার জায়গা নেই। আর ছোটমামার বাড়িতে তো হতেই পারে না, কারণ দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী পুঁটিবৌদি এই আজকের দিনেও পাতা কেটে চুল আঁচড়ান, হাতা-ওয়ালা আঁটো বডি গায়ে দেন, এক বর্ণ ইংরিজি জানেন না বলে মামী তাঁর উপর হাড়ে চটা। দক্ষিণাবাবুকেও দেখলেই রেগে যায়।

যদিও ছোটমামাকে আর দক্ষিণাবাবুকে অপিসের কাজে মাসে মাসে দার্জিলিং যেতে হত, পুঁটিবৌদির শিলিগুড়ি ছেড়ে নড়বার উপায় ছিল না। বুড়ো রুগ্ন শ্বশুর, দজ্জাল শাশুড়ি, এক পাল বেয়াড়া দেওর ননদ ইত্যাদি, তার ওপর খিটখিটে এক গৃহ-দেবতা। অন্ততঃ শাশুড়ি বলতেন যে পান থেকে চুন খসলে তিনি নাকি অনর্থ করবেন। মোট কথা পঁচিশ বছর শিলিগুড়িতে কাটিয়েও তাঁর দারজিলিং দেখা হল না। খালি পরিষ্কার দিন থাকলে, বিকেলে পূজোর ফুল আনার নাম করে বড় রাস্তার ওপর পালদের বাড়ি গিয়ে, মাঝে মাঝে অনেক দূরে ছায়া-

ছায়া মস্ত মস্ত হাতির মতো কি যেন দেখতে পেতেন আর ভাবতেন, "আহা, ঐ হল দারজিলিং, ওখান থেকে হিমালয় দেখা যায়।" অমনি দু হাত তুলে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার করতেন। হিমালয় হলেন দেবতা। তেমন করে কিছু চাইতে পারলে তাঁর দয়া হয়। মনে মনে বলতেন, "ঠাকুর, তোমার যদি অসুবিধা না হয় তো একবার দারজিলিং দেখিও!"

এখন বুড়ো হয়েছে, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বর্গে গেছেন, বেয়াড়া দেওর-ননদগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, শিলিগুড়ির বাড়ি কবে বিক্রি হয়ে গেছে। এমন সময় পুঁটিবৌদির পিসতুতো ভাই দারজিলিং থেকে চিঠি লিখলেন, "কার্ট রোডের নিচে আমার 'সূরিয়া' হোটেল খুবই ভালো চলছে। দুঃখের বিষয় গিন্নীকে নিয়ে দুমাসের জন্য আমাকে দক্ষিণ-ভারতে তীর্থ করতে যেতে হচ্ছে। দক্ষিণাবাবুর তো রেলের রেস্তোরাঁর অভ্যাস আছে, এ দিকের হালচাল-ও জানা আছে। তোরা যদি দয়া করে ঐ দুটো মাস হোটেলটার ভার নিস্ তাহলে বেঁচে যাই। খরচপত্র পাঁচশো টাকা পাঠালাম।"

দক্ষিণাবাবু ডাক্তারের কাছে গেছিলেন, কেমন একটা ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হচ্ছিল রোজ। পুঁটিবৌদি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই উত্তর দিয়ে দিলেন যে অতি অবশ্যই তাঁরা ঐ তারিখে দারজিলিং-এ পৌঁছবেন। তাঁর অনেক দিনের শখ ঠাকুর পূর্ণ করলেন ইত্যাদি। তারপর পাশের বাড়ির বটকেষ্ট ঠাকুরপোকে দিয়ে ঠিকানা লিখিয়ে দক্ষিণাবাবু ফিরবার আগেই একেবারে পোষ্টাপিসে পাঠিয়ে ডাকে দিলেন যাতে অন্যথা না হয়। বটকেষ্ট ঠাকুরপো হল আমার ছোটমামা।

দক্ষিণাবাবু এসেই ক্যাম্বিসের ডেক-চেয়ারে বসে গোঁজ হয়ে রইলেন। জুতো পর্যন্ত ছাড়লেন না। পুঁটিবৌদি চটি এনে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, "কি হল?"

দক্ষিণাবাবু কাষ্ঠ হেসে বললেন, "দারজিলিং, কারসিয়াং যেতে বলছে।"

পুঁটিবৌদি বললেন, "সূরিয়া মানে কি ?"

দক্ষিণাবাবু বিরক্ত হলেন, "সূরিয়া মানে সূর্য। তাই দিয়ে কি হবে ?"

ঐ তো ঠিকানা। সূরিয়া, ওয়াডেল্ রোড, দারজিলিং। দক্ষিণাবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর অনেক ধৈর্য অবলম্বন করে বৌদির কাছ থেকে চিঠি আদায় করে, সেটা পড়ে বললেন,

"নিঃসন্দেহে ভগবানের দয়া। কিন্তু এই শরীর নিয়ে হোটেলের ঝক্কি বইতে পারব কেন ?"

"বটকেষ্ট ঠাকুরপো বইবে। তোমার মতো তার বাক্সেও গরম জামা আছে। কুমুদিনী দিদি মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কাশ্মীর গেছেন। বটকেষ্ট ঠাকুরপো যাবেন বলেছেন।"

ব্যস, দুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। কলকাতার বাড়িতে আমার আরেক মামাতো ভাই আর বুড়ো বামুনঠাকুর রইল। ছোট মামা ওদের সঙ্গে রওনা হল। পুঁটিবৌদি পাঁজি দেখে দিন ঠিক করলেন। মুড়ি পরটা সন্দেশ সঙ্গে নিলেন রওনাও হলেন সেখানে নিরাপদে পৌঁছলেন-ও, কিন্তু তার পরেই এক গেরো। 'সূরিয়া' হোটেলে খবর পাওয়া গেল মালিক আর তাঁর স্ত্রী গতকাল তীর্থে গেছেন। কে এক পাঞ্জাবী ছোকরা ছপরি পরে মালিকের কোয়াটার দখল করে আছে, তাকে নাকি মালিক দু'মাস থাকতে বলে গেছেন। হোটেল দেখাশুনো অবশ্যি দক্ষিণাবাবু করবেন।

বলা বাহুল্য ছোকরার সঙ্গে ঝগড়া করা বুদ্ধির কাজ হত না। দক্ষিণাবাবু এতই কাতর হলেন যে সূরিয়া হোটেলের অপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফার্স্ট এড্ দিতে হল। হোটেলেরই হয়তো চেষ্টা করে থাকার ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু পুঁটিবৌদি কিছুতেই রাজি হলেন

না। তিনি রান্নাঘরের ছাদে মোরগ বসে থাকতে দেখেছিলেন।

এতক্ষণ পরে ছোটমামার হঠাৎ ডাঃ ভাগতের বাড়ির কথা মনে পড়ল। সেকালে বাইরে থেকে দেখা চমৎকার বাড়ি, চারদিকে বাঁধানো চাতাল, পাহাড়ের গায়ে চেরি গাছ, ব্ল্যাক-বেরি গাছ। কিন্তু বাড়িতে কেউ থাকত না। ডাঃ ভাগত কোন কালে স্বর্গে গেছেন। আহা! গরীব-দুঃখীদের জন্তু-জানোয়ারদের মিনি-মাগনা চিকিৎসা করতেন; তাঁর বাড়ি থেকে সাহায্য চেয়ে কেউ খালি হাতে ফিরত না। কত অনাথ ছেলে অনাথ কুকুর ও-বাড়িতে থাকত। অথচ লোকের মনে কুসংস্কার যে বলবে, ও-বাড়িতে কিছু আছে, কেউ ওদিক মাড়াবে না। ছোটমামা একবার একটা আইরিশ সেটারের বাচ্চা দিয়েছিল ডাঃ ভাগতকে, গিন্নীতো আর পুষতে দিত না। বেশ খাড়াই রাস্তার ওপর বাড়ি, সেই রাস্তা দিয়ে কেউ সহজে যাবে না! এ-সব কথা ছোটমামা অনেককাল আগেই শুনেছিলেন। দক্ষিণাবাবুও হয়তো শুনেছিলেন, তবে হয়তো মনে নেই। কুকুরটা অনেক দিন ছিল ও-বাড়িতে, সে-ও আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। ডাঃ ভাগত নেই আর কুকুর ১৪।১৫ বছর বাঁচল তো ঢের।

অপিস ঘরের কৌচে দক্ষিণাবাবুকে শুতে বলে, পুঁটিবৌদিকে বসিয়ে ছোটমামা ঐ খাড়া রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে চড়তে লাগলো। অভ্যাসে চলে গেছিল, বেজায় হাঁপ ধরছিল, একটু দূর যায় আর একবার করে পাথরের দেয়ালে বসে হাঁপায়। এমন সময় একটা চমৎকার আইরিশ-সেটার পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে ওর সঙ্গ নিল। ছোটমামা গলে গেল, তার মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে দেখল গলায় কলার বাঁধা। তাতে পেতলের হরফে লেখা রেড্! বাঃ, বেশ নাম। ছোটমামা অনেক সময় ভেবেছিল মামী কুকুর রাখতে দিলে এই রকম কুকুর রাখবে, তার নাম দেবে রেড্। আর সত্যি সত্যি রেড্ এসে হাজির! "রেড্, রেড্" বলে ডাকতেই

কুকুরটা ছোটমামার হাত-মুখ চেটে একাকার করে দিল। মামী দেখলে ফিট্ হত নিশ্চয়।

দম ফিরে এলে ছোটমামা উঠে আবার পথ ধরল। রেড্ সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ছোটমামা যায় আর চেনা পথের সঙ্গে নতুন করে চেনা হয়। ঐ সেই চেরি-গাছ, পথ থেকে হাত বাড়িয়ে ওর ফল পাড়া যায়। ঐ বাঁকের কাছে হঠাৎ দুটো সিঁড়ির ধাপ, অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার ভয়। তার পরেই ডাঃ ভাগতের লাল লোহার ফটক। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রেড্ ল্যাজ নাড়তে লাগল। ছোটমামা মুচকি হাসলে। বলে জন্তুজানোয়ারের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যার সাহায্যে মানুষ কিছু বুঝবার আগেই তারা অলৌকিক ব্যাপার টের পায়। রেড্ কিন্তু ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। লাল জিবটা একটু খুলে রইল, মনে হল মিটিমিটি হাসছে।

চমৎকার যত্নে রাখা বাড়ি। এই নাকি হানাবাড়ির চেহারা! সামনের সবুজ দরজা বন্ধ। পেতলের হাতল, চিঠি ফেলবার চাকতি, ঝক ঝক করছে। দুপাশে জেরেনিয়ম ফুলের সারি, সযত্নে সাজানো ফুলের টব। রেড্ বাড়ির পাশ ঘুরে পিছন দিকে চলল। ছোট-মামাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে মাথা ঘুরিয়ে ল্যাজ নেড়ে আশ্বাস দিতে লাগল।

রান্নাবাড়িটা একটু আলাদা। বড় বাড়ির পিছনে কাচের দরজা থেকে টালির ছাদ দেওয়া লম্বা একটা পথ দিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে সাদা কাপড় পরা ফিটফাট্ এক বুড়ো বেয়ারা বেরিয়ে এসে, সেলাম করল। তার কাছে সমস্যার কথা তুলতেই সে হেসে বলল,

"কোনো অসুবিধা নেই, বাবুসাহেব, মাজির রান্নার জন্য সাহেবের

বামুন-ঠাকুর আছে!" ঝপ করে মনে পড়ল সবাই বলত ডাঃ ভাগত নিরামিষ খান, সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন। ইর সায়েব বোধ হয় তাঁর ভাইপো-টাইপো হবে। তিনি তো ব্যাচেলার ছিলেন।

বামুন-ঠাকুরও বেরিয়ে এল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা হল। বার বাড়ি খুলে কাজ নেই। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটি অথিতিশালা, ডাক্তারের দুই একজন রুগী থাকত। দুটি ঘর, দুটি স্নানের ঘর, সারাদিন রোদে ভরে থাকে, যেদিকে তাকানো যায় হিমালয় পাহাড়। বাইরে প্যান্‌জি ফুল।

সেই বাড়িতে ছোটমামা দক্ষিণাবাবুদের তুলল এবং পরম আরামে ওরা সাত সপ্তাহ কাটাল।

দক্ষিণাবাবু আর বৌদি সারাদিন রোদ পোয়াতেন, বাগানে বেড়াতেন, হিমালয় দেখতেন। ছোটমামা স্থূরিয়া হোটেলের কাজ দেখত। ঐ পাঞ্জাবী ছোকরা ওখানকার ম্যানেজার, তার নিজের কোয়ার্টার ছিল। মালিকের বাড়িতে বোধ হয় কোনো বন্ধুবান্ধবকে তুলেছিল। ছোটমামা কোথায় উঠল, সে বিষয়ে কেউ কৌতূহল দেখাল না। ভালোই হল। ও বিষয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছাও ছোটমামার ছিল না। দুপুরে সে হোটেলে খেত; এক সময় হাট-বাজার করে রাখত। রাতে বাড়ি যাবার সময় সওদা নিয়ে যেত। রেড্ ঐ সন্ট হিল্ রোডের তলায় ওর জন্য রোজ অপেক্ষা করত। বাড়ি পৌঁছে ছোটমামা দেখত আগের দিন কেনা মাছ তরকারি বামুন-ঠাকুর রেঁধে রেখেছে, আর সে কি রান্না!

হু-হু করে সাত সপ্তাহ কেটে গেল, হোটেলে পুঁটিবৌদির নামে চিঠি এল, ওর পিসতুতো দাদা বৌদি এক সপ্তাহ আগেই ফিরে আসছেন। সে খবর পাবামাত্র পাঞ্জাবী ছোকরা মালিকের বাড়ি খালি করে দিয়ে আমতা-আমতা করে এদের এসে বাড়ি দখল করতে বলল। ততদিনে দক্ষিণাবাবুর শরীরে তাগৎ হয়েছে। শেষের দু

সপ্তাহ তিনিই কাজের ভার নিয়েছিলেন। এতে তাঁর খুব সুবিধা হল।

ছোটমামা তাঁদের গুছিয়ে বসিয়ে নিজের সুটকেসটি স্টেশনে জমা করে দিয়ে, শেষ একবারের মত সন্ট হিল্ রোড বেয়ে ওপরে উঠে ডাঃ ভাগতের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। কোথায় ডাঃ ভাগতের বাড়ি? বড় বাড়ির ভিতরে কিছু চিহ্ন ছিল বটে, তার ওপর গোছা গোছা হলদে প্রিমরোজ ফুটে ছিল। রান্নাবাড়ি আর ছোট বাড়ির জায়গাটা কবেকার কোন ধ্বসের সঙ্গে নিচে নেমে গেছিল। সেখানে শুধু একটা সাদা গোলাপলতা বাতাসে দুলছিল।

ছোটমামার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে বড় বড় পা ফেলে নামতে শুরু করল। অমনি চারদিক ঘন ঘুয়াশায় ঢেকে গেল। তার-ই মধ্যে ছোটমামা টের পেল হাতের নিচে রেশমের মতো নরম একটা মাথা। মনটা অমনি শান্ত হয়ে গেল। জীবনের ব্যর্থতাগুলোকে মনে হল কিছু না। সন্ট হিল্ রোডের নিচে পৌঁছে রেড ওর হাত চেটে দিয়ে, চলে গেল।

চোর

আপনারা হয়তো চোরকে ঘৃণা করেন? তা করুন, তবু এ-সব কথা প্রকাশ না করে পারছি না। চোর বলতে যদি ভাবেন আমাদের একটা আস্তানা আছে, সেখান থেকে রোজ রাতে গায়ে তেল মেখে, সিঁদকাঠি বগলে আমি চুরি করতে বেরোই, তাহলে ভুল ভেবেছেন। ও-রকম করলেই হয়েছিল! সঙ্গে সঙ্গে হাজৎ। আমাকে দেখে কেউ চিনতে পারত না। ভিড়ের সঙ্গে মিশে থাকবার মতো দেখতে আমি, কেউ আমার একটা বর্ণনা পর্যন্ত দিতে পারত না। আমি ট্রামে, বাসে, যাত্বঘরের সামনে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতাম। নিজের ঘরবাড়ি চাকরি বাকরি না থাকলেও আমার কোনো অভাব ছিল না। আমার মানিব্যাগ থাকত লোকের পকেটে পকেটে। সে-সব দিন বদলে গেছে। স্থখ কারো পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে না। তাই আমাকে প্রায় তিন মাস ধরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পকেটটা মনে হচ্ছিল একশো মণ ভারি। অথচ সে জিনিসটা খুব ছোট, চেষ্টা করলে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। কানেই পরেছিল সেই মোটা গিন্নী হীরের ইয়ারিং। ঐ তো চেহারা তার আবার শখ দেখুন। স্ক্রুপ ঢিলে হয়ে গেছিল। যাত্বঘরের সিঁড়ির মধ্যিখানে হাতে নিয়ে দেখছিল। দেখলেন তো বুদ্ধির বহর? ও জিনিসের মালিক হবার ওর যোগ্যতা কই?

সিঁড়ির ওপরের বাঁক থেকে ছিনিয়ে নিলাম। নিয়েই দৌড়। যাত্বঘরটা চোরদের স্থবিধার জন্মেই তৈরী। পাঁচ মিনিটে দোতলা

তিনতলা করে প্রায় নিখোঁজ হয়ে গেছি, এমন সময় দালান দিয়ে কয়েকটা লোক দৌড়ে এল আর আমি কেমন করে হাত ফস্কে যে নিচে গিয়ে পড়লাম নিজেই বুঝতে পারলাম না। পড়েই উঠে পালিয়েছিলাম, ধরতে পারেনি। পায়ে চোট লাগেনি, হাতে লেগেছিল কাঁধের ধারে। তার সে কি যন্ত্রণা, এমন ব্যথা যেন আমার কোনো শত্রুরো না হয়। আছে অনেক শত্রু আমার। ঐ গিন্নীর স্বামী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কানের ফুলের জোড়াটি উদ্ধার করে দিলে দু হাজার টাকা বকশিস। নাকি আলাদা করে একেকটা হীরের যত দাম, দুটোকে একসঙ্গে করলে তার দুগুণ নয় পাঁচগুণ। আমাদের জগতে বিশ টাকা দিয়ে খুনে ভাড়া করা যায়, দু হাজার টাকা লিখতে কটা শূন্য দিতে হয় তাই জানে না বেশির ভাগ লোক। পারলে আমার বন্ধুরাই আমাকে ধরিয়ে দিত। সেই ইস্তক পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, চোরের বর্ণনা দেওয়া গেল না, ময়লা শার্ট, সরু ঠ্যাং, কালো পেন্টেলুনপরা, খালি পা, আর তিন তলার সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ছাড়া শরীরের অন্য জায়গায় জখম। পায়ে কিছু হয়নি দুষ্কৃতকারী পালাতে পারত না। এর পর আমার কোথাও গিয়ে যে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করা কত অসম্ভব, সে তো বুঝতেই পারছেন।

সেটাকে ময়লা কাগজে জড়িয়ে, শালপাতায় মুড়ে, পকেটে রেখেছিলাম। ফেলতে পারিনি। যার জন্য আমার এত কষ্ট, তাকে কখনো ফেলা যায়। ভালো মানুষ সেজে অচেনা পাড়ার দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়েছি। এখন পকেটও প্রায় খালি হয়ে এসেছে অথচ কলিমুদ্দির কাছে আমার কিছু কাপড়, টাকাকড়ি রাখা আছে। চাইতে গেলে সে-ই আগে আমাকে ধরিয়ে দেবে। দুহাজার টাকা কি চাট্টিখানিক কথা। ঐ হীরের লোকটা নিজেকে ভারি ধার্মিক ভাবে—নাকি কোথায় মন্দির করে দিয়েছে— অথচ টাকা

দিয়ে ভালো মানুষকে বিশ্বাস করবে, চোরকে খুনে বানাতে একটুও দ্বিধা করে না।

রাতে যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। রাস্তায় বড় পাইপের ভেতর কিংবা তৈরি-হচ্ছে এমন বাড়ির সিঁড়ির নিচে, যেখানে চেনা লোকজন থাকে না এমন সব জায়গায়। এই মুহূর্তে একটা খালি বাড়ি পেলে, চুপ করে সেখানে সাতদিন পড়ে থাকতাম। এ ব্যথা আর সইতে পারছিলাম না। খাব না, দাব না, নড়ব না, চড়ব না, শুধু চুপ করে পড়ে থাকব। এমন কোনো জায়গায় যেখানে কেউ আমার খোঁজ করবে না।

খালি বাড়ি বলে কিছু নেই আজকাল। খিদিরপুরে ডকের কাছে মুন্সীদের হানাবাড়ি ছাড়া। তার ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। যারা যারা আগে গেছিল, তারা নাকি কেউ ফেরেনি। সামনেটা গুদোমঘর, পেছনে ভাঙা বসতবাড়ি। নাকি সিরাজউদ্দৌলার সময়কার বাড়ি, তাঁরি মুন্সীর যেমন মুনিব তেমনি নফর। গুদোমটা অনেক কাল পরে তৈরি। সেকালে কাঠ, তুলোর বস্তা, পাট জাহাজে তোলার আগে এখানে জমা করা হত। খুনে লেঠেলদের আস্তানা। খুব বিশ্রী একটা ব্যাপারের পর পুলিস এসে দরজায় এই বড় তালা লাগিয়ে সীল করে দিয়ে গেছে। সে-ও আজ পঁচিশ ত্রিশ বছর তো বটে। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল। সামনে নিরাপদ তালা মারা, পাশের করগেটের দেয়ালে একটা খিড়কি দোর। তাই দিয়ে ঢুকে শহরের যত ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে, গুণ্ডা, বদমায়েসরা নিশ্চিন্ত আরামে রাত কাটাত। তারপর তারাও ও-জায়গা ছাড়তে বাধ্য হল। রাতে নাকি কি-সব দেখত। বছর কুড়ি গুদোম খালি। সাপ-খোপরা থাকে। পেছনেই মস্ত বাড়ি না প্রাসাদ। তাকে মরণ-দশায় ধরেছে। বাইরের পলেস্তারা খসে গেছে, ইঁট বেরিয়ে এসেছে, জানালা দরজা ঝুলে পড়েছে, বট-অশ্বত্থ গজিয়েছে। চারদিকে একটা ভ্যাপসা

গন্ধ। হাঁটু অবধি আগাছা; এ জমিতে কতকাল কেউ হাঁটেনি।

আমার শরীর জবাব দিয়েছিল। কাঁধটা ফুলে ঢোল। পকেটে শালপাতায় মোড়া সেই জিনিসটা আর ডকের দোকান থেকে লুকিয়ে আনা ছোট একটা পাঁউরুটি। দিনের আলো প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের বিষয় মুন্সীবাড়ির ভাঙা সিং-দরজার বাইরে একটা সরকারী কল। তার মুখ থেকে সরু ধারায় জল পড়ছে তো জলই পড়ে যাচ্ছে। নিচে চকচকে সবুজ শ্যাওলা জমে গেছে। সেই জলে হাত মুখ পা ধুলাম। কতকাল গায়ে জল পড়েনি সে আর কি বলব। আঁচলা ভরে জল খেলাম। জলের মতো আছে কি? ভগবানের দান। আমার মতো হতভাগাকেও কেমন প্রাণ ভরে জল খেতে দিলেন দেখেও অবাক হলাম। তাও যদি অনুতাপ-হওয়া পাপী হতাম। গির্জার বারান্দায় একবার শুয়েছিলাম। অনেক রাতে পাদ্রী এসে ডেকে তুলে আমাকে হাত-পা ধোবার জল, একটা মাটির হাঁড়ি ভরতি সুরুয়া আর বড় এক টুকরো রুটি দিয়েছিল। তখন শীতকাল, গায়ে দেবার জন্য একটা ছেঁড়া কম্বলও দিয়েছিল। বলেছিল পাপীরা অনুতাপ করলে যীশু তাদের বুকে টেনে নেন। ভোরে কম্বলটা নিয়ে পালিয়েছিলাম। আমার মতো নোংরা ছেলেকে যীশু যে বুকে টেনে নেবেন না, তাতে কারো সন্দেহ নেই। সেই কম্বলটা এখনো আমার জিনিসপত্রের সঙ্গে কলিমুদ্দিনের ঘরে পড়ে আছে। চিরকাল তাই থাকবে। হীরেচুরি যেমন তেমন অপরাধ নয়। দশ বছরেও মাপ হয় না।

মানুষের জীবনে এমন সব সময় আসে যখন মনের ভয়ভাবনা সব দূর হয়ে গিয়ে, শরীরের দরকারটাই সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে। ভাবছিলাম ঐ হানাবাড়িটাতে গিয়ে শুয়ে থাকলেই তো ল্যাঠা চোকে। মুখ তুলে দেখি মুন্সীবাড়ী নিতান্ত খালি নয়। একজন সাদা-কাপড়-পরা বুড়ো বামুন হাতে একটা ছোট্ট তেলের কুপি নিয়ে

আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাসি পেল। আজকাল কখনো বাড়ি খালি পড়ে থাকে? লোকটি সটাং আমার কাছে এসে বললেন, "কলটা বন্ধ করে দাও। জলপড়ার শব্দে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়।" তাই দিলাম। বুড়ো খুশি হয়ে বললেন, "কি চাও? এখানে কেউ আসে না। এটাকে বলে হানাবাড়ি। ভয় পায়। আমি মায়ে-খেদানো ঠগ জোচ্চোর বদমায়েস চোর।"

বললাম, "গুরুঠাকুর, কিছু চাই না। শুধু সাত দিন কোথাও গিয়ে চুপ করে পড়ে ডাকতে চাই। কাঁধে বড় ব্যাথা। পা আর চলে না।" বুড়ো এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, "এসো আমার সঙ্গে। উঃফ্! বাচা গেল! লোকও যেমন, বলে কিনা ভূতের বাড়ি, তবু ভাগ্যিস্ তাই বলে, নইলে আর দেখতে হত না। ঘরে ঘরে কাঠের জ্বালে হাঁড়ি বসত। আমাকে পালাতে হত।"

তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠতে হয়। কিছুতেই পা আর উঠল না। হাঁটু দুটো কি-রকম জুড়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বুড়ো ভদ্রলোকই নিশ্চয় আমাকে ধরে ঘরে তুলেছিলেন। দোতলার ঘর, বুড়োর হাড় শক্ত বলতে হবে। যখন জ্ঞান হল অমন যে ক্লান্তি, তাও দূর হয়ে গেছে। বলেছিলাম সাত দিন চুপ করে পড়ে থাকব। নিজের দরকারে একবার উঠে সেই যে আবার শুলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর জাগিনি, বুড়ো বামুনকেও আর দেখিনি। তিনি বা আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন? কাষ্ঠ হাসলাম। বিশ্বাস করবার মতো চেহারা বটে আমার!! কেন জানি, একটুও খিদে পায়নি। তবু অভ্যাসের জোরে পকেট দেখলাম। কই পাঁউরুটিটা তো নেই। যাক গে পাঁউরুটি। পাশ ফিরে আবার ঘুমোলাম। খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের আর কোন দরকার নেই। শুধু ঘুম। হয়তো সত্যিই রাতদিন ঘুমিয়েছিলাম? তারপর একদিন সকাল বেলায় জেগে উঠে দেখি, শরীরটা একেবারে ঝরঝরে

হয়ে গেছে। বাইরে থেকে একটা মহা হট্টগোল কানে এল।

ঘরের জানালার পাল্লা নেই। চেয়ে দেখি আগাছায় ভরা উঠোনে ট্রাক কপি-কল, অদ্ভুত চেহারার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি। আর মেলা লোকজন।

পাশে এসে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। বললেন, "এবার তোমাকে আমাকে এখান থেকে সরতে হয়। বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে। বেওয়ারিশ সম্পত্তি, সরকার দখল নিচ্ছেন! ঐ কড়িকাঠটার ওপর আমার মা-কালী লুকোনো আছেন, দেখ তো পাড়তে পার কি না!" হাসি পেল; আমি দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠতে পারি। কুলুঙ্গীতে এক পা, জানালার মাথায় এক পা হাত বাড়িয়ে কড়ি কাঠের ওপর থেকে আমার করে আঙুলটার মতো ছোট্ট মা-কালীর মূর্তিটি পেড়ে আলগোছে তাঁকে দিলাম। কে জানে সোনার কি না। সেই রকমই ঠাওর হল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে গড় করে বললাম, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। যা বলবেন তাই করব।" বুড়ো বললেন, যা এবার। গলিতে ভূতের বাড়ি ভাঙা দেখতে ভিড় জমেছে, তাদের সঙ্গে মিশে যা গে। অন্য সব ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। এবার রওনা দে। কোনো ভয় নেই।"

হঠাৎ কাঁধে ব্যথার কথা মনে পড়তেই টের পেলাম সে একেবারে সেরে গেছে। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, সেটাও নেই। উঃফ্ বাঁচা গেল। কিন্তু বুড়ো লোকটি কোথায় গেলেন? জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, ভিড়ের মধ্যিখান দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে গঙ্গার দিকে চলেছেন। আমিও তখন নেমে এলাম। ভিড়ের লোকেরা গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে কত রকম যে মন্তব্য করছিল তার ঠিক নেই। ভূত বাছাধন এবার টের পাবেন। দুশো বছরের মৌরসী পাট্টা এবার উঠল। হেনা-তেনা কত কি। একজন আবার বললেন, "এদের চাইতে তারই অধিকার বেশি। তার বাপের সম্পত্তি!

বামুন মানুষ, কালীভক্ত।” সবাই শূন্যে নমস্কার করতে লাগল। হাসি পেল। তখনো বুড়ো লোকটিকে দূরে দেখা যাচ্ছিল। লোক-গুলোর মাথা খারাপ। গঙ্গার ধারে পৌঁছে নৌকোটৌকো চেপে থাকবেন, সেখানে গিয়ে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম সঙ্গে যাব।

তার বদলে সটাং কলিমুদ্দির কাছে গেলাম। যা হয় একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাক। আর পালিয়ে বেড়াব না, মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। আমাকে দেখেই কলিমুদ্দি ছুটে এসে পায়ে পড়ল। আমাকে মাপ কর। ত্থ' হাজার টাকা বখশিস্ দেবে বলেছিল। লোভ হয় কিনা তুই-ই বল্? এদিকে তুই ফিরছিস্ না দেখে, আমি কি ভাবতে কি ভেবে বসলাম রে! তোর নামধাম সব গিয়ে থানায় লিখিয়ে এলাম। ক'দিন ধরে সরু চিরুনি দিয়ে শহরটাকে আঁচড়ে ফেলেছিল এরা। এখন কাগজে দিয়েছে ইয়ারিং মোটে হারায়নি, মোটা গিন্নীর হাত-ব্যাগের মধ্যেই পড়েছিল, এদ্দিনে পাওয়া গেছে! থানার লোক এসে আমাকে যা নয় তাই বলে গেছে। তাকে হেনস্তা করার জন্য মালিক তোর জন্য পাঁচশো টাকা জমা দিয়েছে। সেটি গিয়ে নিয়ে আয়। আমিও যাচ্ছি। তোকে সনাক্ত করতে হবে তো। তা ছিলি কোথায়?”

আমি বললাম, “একটু বাইরে গেছলাম। থানার লোকে আমাকে চেনে, সনাক্ত করতে হবে না।”

তবু সনাক্ত করতে বেশ হামলা হয়েছিল। শেষটা যখন টাকাটা সত্যি পাওয়া গেল, কলিমুদ্দিকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিলাম— আমার কাপড় চোপড় আর টাকাকড়ি যা তোর কাছে আছে, সে সব তোকে দিয়ে আমি দেশে গেলাম।”

তাই চলে যাচ্ছি দেশে এই রেলে চেপে। সেখানে আমার মা আছে, কিছু জমিজমাও আছে। চলে যাবে এক রকম করে।

বাপের ভিটে

আমার গয়নাদিদি, আসলে অন্য নাম, চটে যাবেন বলে ঐ নাম দিয়েছি। ভালো নাম না?—একবার বুড়ো বয়সে ছেলে-বৌয়ের ওপর রেগেমেগে, কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর যেতে, আধা-পথ দূরে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, তাঁর বাপ-পিতেমোর আদি বাড়িতে চলে গেছিলেন। সে এক অদ্ভুত জায়গা। জগন্নাথ ঘাট থেকে নৌকোয় উঠে, সাত ঘণ্টা বাদে মকরঘাটায় নামতে হয়। যেমন নাম তেমনি জায়গা। সেকালে নাকি বড় বড় শুড়-তোলা মকর ড্যাঙায় উঠে শীতকালে রোদ পোয়াত। তাদের মুখের লালা শুকিয়ে নদীর পাড়ে ঝিনুকের মতো রঙের মুক্তোর মতো গোল সব মণি তৈরি হত। সেই মকর-মণি যারা কুড়োত, তাদের আর ফিরে চাইতে হত না। বলেছি না অদ্ভুত জায়গা।

মকরঘাটায় একটা ছোট টিনের ট্রাঙ্ক, একটা ছোট শতরঞ্জির বিছানা আর একটা আরো ছোট বেতের ঝুড়ি সুদ্ধ গয়নাদিদিকে নামিয়ে, দিয়ে তুকুল মাঝি বলল, "তা বুড়ো-মায়ের থাকা হবেটা কোথায়? নিতে তো কেউ এসেনি।" গয়নাদিদি রেগে বললেন, এসবে আবার কেটা রে? বাপ-পিতেমোর বাড়ি আসছি, তার জন্য কি মিছিল করতে হবে? জিনিস বইবার লোক দে। নন্দীবাড়ি পৌঁছে দেবে, কাছেই কোথাও হবে। ঘাট থেকে হাঁক দিয়ে বুড়ো-ঠাকুরদা বরকন্দাজ আনাতেন।"

শুনে মাঝি কাঠ! "সে-বাড়িতো ভালো না, মা। ওখানে জন মানুষ থাকে না।" গয়নাদিদি চটে গেলেন, "কথার ছিরি দেখ!

আমার বাপ-পিতেমোর ভিটে। তাঁরা এক দিনের জন্যেও নিজেদের ভিটে ছেড়ে আর কোথায় রাত কাটাননি। আজ বলে কিনা কেউ থাকে না।" মাঝি বলল, "ঠিক তাই। সেই জন্যেই মানা করতিছি।" তারপর গয়নাদিদিকে নিজেই বাক্স তোলার জোগাড় করতে দেখে, গলুইয়ের ওপর যে লোকটা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, "এই মাধো! মাঠানের জিনিস নন্দীবাড়ি পৌঁছে দে আয়। এক টাকা পাবি।" গয়নাদিদি ভেবেছিলেন পঞ্চাশ পয়সা দেবেন. তা গতিক দেখে চুপ করে রইলেন।

মাধো জিনিস নিয়ে বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটা দিল। গয়নাদিদি পাঁচ-সাত মিনিটে বাপ-পিতেমোর ভিটেয় পৌঁছে গেলেন। মাধো পাঁচীলে-বসানো তালাবন্ধ দরজার সামনে মোট নামিয়ে বলল, "টাকাটে দেখি। আমি ভেতরে পা দিচ্ছিনে। জিনিস কে ঘরে তুলবে?"

গয়নাদিদি বললেন, "দেখি ডাকাডাকি করে, কেউ যদি থাকে।"

মাধো জিব কেটে বললে, "ও-কাজ করবেন না। ডাকলে ঠিক এসে হাজির হবে। নিন্ দরজা খুলুন, আমিই তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কাজের লোক এ মুলুকে পাবেন নি মা। বাঁশবাগানের পাশে বামুনের দোকানে কেরাসিন, কয়লা, রান্না খাবার পর্যন্ত পাবেন। এ বাড়িতে জন-মানুষ থাকবেনি।"

গয়নাদিদি চারদিকে চেয়ে বললেন, "না, থাকবে না!! চালাকি পেয়েছ? থাকবে না তো তুলসীতলা ঝাটপাট দিয়েছে কে শুনি?"

"মাধো শিউরে উঠে বলল, "সেই কথাই তো বলছিলাম। টাকাটে দেন।" গয়নাদিদি টাকা দিয়ে বললেন, "বাঁশবাগানের ও-ধারে গয়লাবাড়ি দেখলাম। সেরটাক দুধ পাঠিয়ে দিস, নগদ দাম দেব।" মাধো বলল, "তাহলে দরজা খোলা রাখবেন।" ঘরের তক্তাপোষ, জলচৌকি, পিঁড়ি সব কাঁঠাল কাঠের তৈরি। পরিষ্কার-ঝরিষ্কার।

বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে খুলতে গয়লা দুধ নিয়ে এসে বাইরে থেকে ডেকে বলল, "দুধ লেন, আমি ভেতরে যাবনি। সুয্যি হেলেছেন।" যত সব কুসংস্কার! গয়নাদিদি দুধের হাঁড়ি নিয়ে বেরোতেই, গয়লা বলল, "মোক্ষদা পিসির বাড়িতে ঘর পেতে। সেইটেই ভালো হত।"

দিদি রেগে গেলেন, 'বাপ-পিতেমোর বাড়ির চেয়ে সেইটেই কি ভালো হত? তাঁরা তেতে-পুড়ে এইখানে এসে প্রাণ জুড়োতেন। সিপাই-হাঙ্গামার সময় বুড়ো-ঠাকুমা ছেলেপুলে নিয়ে এইখানে উঠে প্রাণ-বাঁচিয়েছিলেন। কেন, হয়টা কি? চোর-ডাকাত আসে?"

"এজ্ঞে রেতে ছাদে ধুপধাপ পড়ে।" "পড়ুক। আর কি?"

"গোয়ালে কারা রাত কাটায় তুলসীতলায় আলো দেয়।"

"ভালো করে। আমার বাড়িতে আজ আমি আলো দেব।" গয়লা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "তবে আর কিছু বলব নি।"

ভেতরের উঠোন কিন্তু আবর্জনায় ভরা। গয়নাদিদি গোয়াল ঘরের দিকে মুখ করে হাঁক দিলেন, "কে আছিস্ ওখানে, উঠোন ঝেঁটিয়ে-পেটিয়ে রাখতে পারিস্ না।" ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। কে একটা গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁট দিতে শুরু করে দিল।

উঠোনের কোণে ছোট কুয়ো। গয়নাদিদি ঝুড়ি থেকে খুদে বালতি আর দড়ি বের করে, তারার আলোয় সাবান মেখে চান করে ঘরে এসে, আহ্নিক করলেন। গোয়ালঘর চুপচাপ। আর কি তারা আসে, যদি কাজ করতে হয়! লুচি, সন্দেশ, মর্তমান কলা খেয়ে ঘুম। রাতে একবার ছাদে ধুপধাপ শব্দ হল বটে। তা হক।

ভোরে উঠে গয়নাদিদি দিনের আলোয় দেখলেন গোয়াল-ঘরের দোরে তালা দেওয়া। কুয়োর পাশের চৌবাচ্চাতে কাণায় কাণায় জল। ছাদে গিয়ে দেখলেন: তাল পড়েছে, নারকেল পড়েছে, তা ধুপধাপ হবে না? নিচে এসে দেখলেন ভেতরের দালানে এক

কাঁদি কলা। চোর-ই হক, ছ্যাচড়-ই হক, যারা গোয়ালে রাত কাটায় তারা লোক ভালো। দয়ামায়া আছে শরীরে।

গয়লা যেমন বলেছিল সদর দরজা খুলেই রাখলেন। সে দুধের সঙ্গে, চাল, ডাল, আনাজপত্র দিয়ে পয়সা নিয়ে গেল। এক পয়সা বাকি রাখল না। বলল, "কিছু বলা যায় না মা, ভালো কথা তো শুনলেন না। রেতে কেউ আসেনি ?"

গয়নাদিদি বললেন, "না।"

সন্ধ্যেবেলায় দালানের পাশে ইঁট পেতে উনুন করে, তালের বড়া, তালের ক্ষীর, তৈরি করে, আহ্নিক সেরে উঠেই থামের পেছন থেকে একটা কালো রোগা ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করলেন। হতভাগার গায়ে একটা ত্যানা নেই। "কি নাম তোর ?" কিলবিল করতে করতে সে বলল, "এজ্ঞে, পেঁচো।"

"এত ধেড়ে ছেলে উদোম ঘুরছিস্, লজ্জা করে না ?"

"এজ্ঞে, না।" গয়নাদিদি তাকে গায়ের চাদর খুলে দিয়ে বললেন, "কলাপাতায় তালের বড়া, তালের ক্ষীর দিচ্ছি, নিয়ে যা। ঘরে আর কে আছে ?"

"এজ্ঞে, মা আছে।" বেশি করেই দিলেন, ছেলেটা এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সাত দিন ছিলেন গয়নাদিদি, কোনো কষ্ট হয়নি। দিনের বেলায় শুনশাম্ রাতে তারা কাজ সেরে দিত। চোরের পরিবার সন্দেহ নেই। তবে দেখা পাননি আর। সাত দিন পরে ছেলে-বৌ এসে পায়ে ধরে মাপ চেয়ে, কেঁদেকেটে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। শেষ বারের মতো ভেতরের দালানে দাঁড়াতেই তাদের দেখতে পেলেন, দিনের আলোতেই। চাদর-জড়ানো পেঁচো আর তার রোগা কালো নাক-কাটা মা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তারা, তারপরেই আর দেখতে পেলেন না। ছেলে বাঁধা-ছাঁদা সেরে বলল, "বেশ তো

ছিলে মনে হচ্ছে, মা। অথচ এদিককার লোকদের এমনি কুসংস্কার, নৌকোর তুকুল মাঝি বললে কিনা বুড়ো কর্তাদাদার সময়ে গয়লা পাড়া থেকে কে তার দুষ্টু বৌয়ের নাক কেটে, ছেলে সুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছেলেটাও নাকি মহা পাজি ছিল। তা বুড়ো কর্তাদাদু তাদের সারাজীবন তাঁর গোয়াল-ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনি তাঁর বুকের পাটা যে কেউ তাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারে নি। তারাই নাকি এখনো বাড়ি আগলায়, কাউকে আধ ঘণ্টার বেশি টিকতে দেয় না। তুমি কিছু দেখেছিলে? গবর্নমেণ্ট নাকি নিতে চেয়েছিল, তা সব ভয়ে পালিয়ে এসেছিল।"

গয়নাদিদি বললেন, "নিজের বাড়িতে দেখবার কি আছে? এই আমি বলে দিলাম তোকে মদন, এখন থেকে আম-কাঁঠালের সময় প্রত্যেক বছর ছয় মাস আমি এখানে কাটাব। কি জায়গা বল্ দিকিনি! নদীর ধারে এই বড় বড় মুক্তো গজায়, বলেনি তুকুল মাঝি? ভূত আসে না আরো কিছু। ভূত এলে আমি দেখতে পেতাম না!"

মদনের বৌ বলল, "একলা কি করে থাকবেন, মা? শুনেছি কাজ করবার লোক পাওয়া যায় না।"

তুকুল মাঝি দড়ি খুলে দিয়ে বলল, "অন্য জায়গায় থাকলে পাওয়া যেত। নন্দী বাড়িতে কেউ পা দেবে না।"

গয়নাদিদি ফোঁস করে উঠলেন, "যত রাজ্যের বাজে কথা। লোক ওখানে যথেষ্ট আছে। কি ঝটিতি-পটিতি কাজ তাদের! কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! এক কণা ধুলো তো পড়ে থাকেই না, রেতে টেমির আলোতে স্পষ্ট দেখেছি দুটো-দুটো লোক কাজ করে যায়, তা মাটিতে এতটুকু ছায়া পড়ে না! হাঁ করে আছিস্ যে বড়, কি হল তোদের?"

দজ্জাল বৌ

লাটুবাবু বলে একজন ভারি ভালোমানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বৌটি এমনি দজ্জাল যে, কোনো একটা বাড়িতে তাঁরা তিন মাসের বেশি টিকতে পারতেন না। তারি মধ্যে হয় পাশের বাড়ির লোকদের সঙ্গে, নয় বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে, নয়তো বাড়ির নানা খুঁৎ নিয়ে লাটুবাবুর ওপর রাগারাগি করে, শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে হত। এদিকে ভদ্রলোকের পক্ষে মাসে দুশো টাকার বেশি বাড়িভাড়া দেওয়া মুশকিল। শেষকালে এমন দাঁড়াল যে ঐ ভাড়ার মধ্যে কলকাতা শহরে, কিংবা শহরতলীতে আর একটিও বাড়ি বাকি না থাকার মতো হল। এই সময় গিন্নি আবার অশান্তি করে বাড়ি ছাড়বার জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে খেতে লাগিলেন।

এর মধ্যে একদিন বাড়ি ফেরার পথে এক দালালের সঙ্গে দেখা। সে বলল নাকি বেহালার ওদিকে একটা চমৎকার বাড়ি আছে, ভারি সুবিধার দরে পাওয়া যেতে পারে। কি ব্যাপার? ও-বাড়িতে কেউ যদি এক টানা সাত দিন থাকে, বাড়িওয়ালা তাকে বিনি পয়সায় ছয়মাস থাকতে তো দেবেনই, তার পরেও খুব কম ভাড়াতেই থাকতে দেবেন।

লাটুবাবু বললেন, "চলুন মালিকের বাড়ি গিয়ে কথাটা পাকা করে আসি। আপনাকে কিছু দিতে হবে নাকি?" দালাল জিব কেটে বলল, "না না। আমাকে যা দেবার মালিকই দেবেন। তা বাড়িটা একবার দেখবেন না?" লাটুবাবু ঘাড় নাড়লেন, "কিছু দরকার নেই। সব বাড়িতেই আমার এক হাল হয়।"

মালিকের বাড়ি গিয়ে লেখাপড়া করে দিয়ে, চাবি পকেটে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলে পর, দালাল কেমন একটু উসখুস্ করতে লাগল।

"আবার কি হল ?"

দালাল বলল, "দেখুন তাড়াহুড়োয় আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি বলে বিবেক দংশন করছে।"

লাটুবাবু বললেন, "কি কথা ?"

"ইয়ে—মানে রোজ রাতে যে ঐ বাড়িতে আসে, সে একটা গলায়-দড়ে, মানুষ নয়।"

লাটুবাবু ঢোক গিলে বললেন, "তাতে কি হয়েছে ? আমার তো নাইট্‌-ডিউটি। গিন্নি সামলাবেন।"

পরদিন সকালে টেম্পো করে জিনিসপত্র নিয়ে দালালের সঙ্গে ওঁরা বেহালা গেলেন। দালাল পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল। গিন্নি বাড়ি দেখে মহা খুসি। বলেন কি না, "ওগো, এমন সুন্দর বাড়িতে আমি জীবনে থাকিনি। আর বাড়ি বদল নয়। এখানেই জীবন কাটিয়ে দেব।"

তারপর দুজনে মিলে হাতে হাতে ঘরদোর গুছিয়ে ফেললেন। রাতে কর্তার নাইট ডিউটি; গিন্নি তাড়াতাড়ি তাঁকে রেঁধে খাইয়ে, বই-বাক্সে রাতের টিপিন ভরে রওনা করিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে লাটুবাবু ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলেন। কে জানে বাড়ি ফিরে কি সর্বনাশ দেখবেন। কড়া নাড়তেই হাসিমুখে গিন্নি দরজা খুলে দিলেন।

"এসো, এসো, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে খেত বস। আমি ডবল ডিমের মামলেট ভাজছি।"

খেতে খেতে লাটুবাবু ইদিক-উদিক তাকাচ্ছেন। কই, না-তো, অস্বাভাবিক কিছু তো চোখে পড়ছে না, সবই তো যেমন হওয়া উচিত তেমনি। গিন্নির বাবা ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগীর, তাঁর নিজের আখড়া ছিল, সেখানে ছেলেরা মুগুর ভাঁজত। তাঁর একটা বড় আদরের কাঁঠাল কাঠের মুগুর-ও ছিল। গিন্নি সেটিকে একটা বেশ
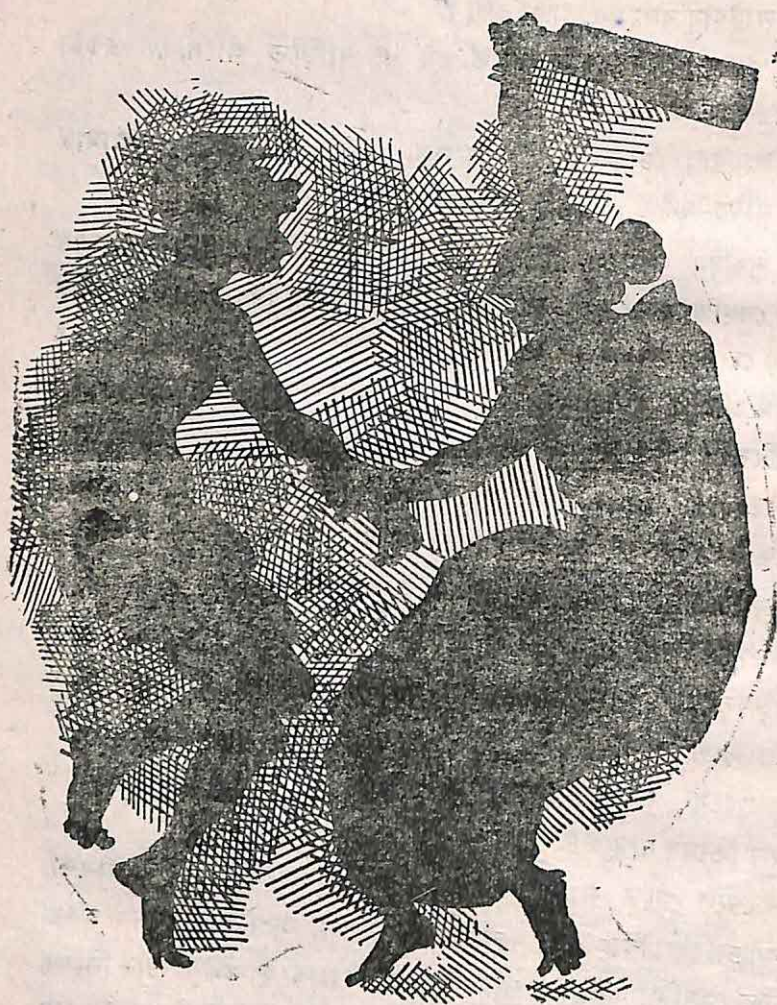
দর্শনীয় স্থানে সাজিয়ে রেখেছেন।

এমন সময় গিন্নিরো সেদিকে চোখ পড়াতে, তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা। বলতেই ভুলে গেছিলাম, কাল রাতে এক ব্যাটা চোর এসেছিল, বুঝলে? রান্নাঘরে বাসনের বাক্স থেকে বাসন বের করে তাকে সাজাচ্ছি, দেখি এক ব্যাটা গুটি গুটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পকেট থেকে খানিকটা দড়ি ঝুলছে। সব দরজা-জানলা বন্ধ, কোথা দিয়ে যে সেঁদুল বুঝলাম না। তা সে তো উপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু আমিও বিষ্টু গোঁসাই-এর মেয়ে, আমিও কিছু কম যাই না। বাসনের বাক্স থেকে মুগুরটা নিয়ে চুপি চুপি পেছন থেকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার ঘাড়ে!! কি সব মেখেটেকে এসেছিল, কেমন হাত থেকে পেছ্‌লে পেছ্‌লে যাচ্ছিল। আমিও ছাড়বার বাঁদী নই। মুগুর দিয়ে আগা-পাশ-তলা এমনি পেটনাই দিলাম যে বোধ হয় ব্যাটাচ্ছেলের নাকটাই ভেঙে গেছল। শেষে নাকি সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, "যাঁচ্ছি যাঁচ্ছি যাঁচ্ছি, ওঁ বাঁবা গোঁ! ছাঁড়ান দিঁন! ছাঁড়ান দিঁন! এঁই আঁমি কঁথা দিঁচ্ছি আঁর কঁখনো এঁ-বাঁড়িতে আঁসব না!" তাপ্পর সুড়ুৎ করে কেমন করে যে সটকান দিল তাও ভেবে পেলাম না। অনেক খুঁজেও আর দেখতে পেলাম না। দরজা-জানলা তো যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধ—"

এদ্দুর শুনে আঁক্—আঁক্ শব্দ করে লাটুবাবু হাত পা এলিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুখে অনেক জলের ঝাপটা দিতে তবে সুস্থ হলেন।

ব্যাপারটার শেষটা কিন্তু ভালো। ওঁরা ঐ বাড়িতে প্রথমে ৭ দিন, তারপর ৬ মাস বিনি ভাড়ায় থাকবার পর, খুব কম ভাড়ায় আরো ৬ মাস থেকে, এখন সস্তা দরে বাড়িখানা কিনে সেখানে দিব্যি বসবাস করছেন। এক দিকে ধানক্ষেত, অন্য দিকে বিস্কুট কারখানার নিরেট দেওয়াল। পাড়া-পড়শীর বালাই নেই।

ভূতের ব্যাপার-ই আলাদা

আমাদের পাড়ায় একটা পুরনো বাড়ি আছে, হয়তো দুশো বছরেরো বেশি পুরনো হবে, সেখানে কেউ থাকতে চায় না। তাই বলে যেন কেউ ভেবে না বসেন যে বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মোটেই তা নয়। তবে রাতে তার সামনের বারান্দায় কেউ যায় না। সবাই বলে সেখানে নাকি লম্বা কালো কোটপরা এক রোগা সায়েব পায়চারি করে, তার সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট দেখা যায়, পায়ের পাতা দুটো ছাড়া। পায়ের কব্জি দুটো মেঝের ওপর বসানো থাকে, তাই দিয়েই সে পায়চারি করে।

এমন অদ্ভুত ব্যাপারের মানেটা কেউ বুঝত না। রোগা সায়েবের ভূত না হয় বারান্দায় হাঁটল, কিন্তু তার পায়ের পাতা, জুতো-মোজা সব গেল কোথায়? আমাদের চেনা এক ফিরিঙ্গি সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে ওঁর ঠাকুরদা, অনেক কাল আগে ও-বাড়িতে থাকতেন। তখনো রোগা সায়েবের ভূত বারান্দায় হাঁটত। কিন্তু তার পায়ের জুতো-মোজা সব দেখা যেত। এদিকে বিষ্টি পড়লে রাস্তায় জল দাঁড়াত, ঐ বারান্দা জলে ডুবে যেত। তাই বাড়িওলা এক প্রস্থ ইঁট পেতে, মেঝেটাকে তিন ইঞ্চি উঁচু করে দিল। সেই থেকে রোগা ভূতের পায়ের জুতো দেখা যায় না। সে হয়তো টের পায়নি মেঝে উঁচু করা হয়েছে, তাই সে পুরনো নিচু মেঝেতেই হাঁটে, কাজেই জুতো দেখা যায় না।

কলকাতায় যে এই রকম সাংঘাতিক ভিড়, এর সকলে কক্ষনো মানুষ নয়, এ সন্দেহ আমার অনেকবার হয়েছে। ঐ যে ট্রামে বাসের যেখানে এতটুকু ধরে ঝুলবারো জায়গা নেই, সেখানেও যারা লটকে থাকে, তারা কখনো মানুষ হতে পারে? একবার এক পণ্ডিত মশাই অনেক কষ্টে ছাতার বাঁট জানালার শিকে লাগিয়ে, তাই ধরে
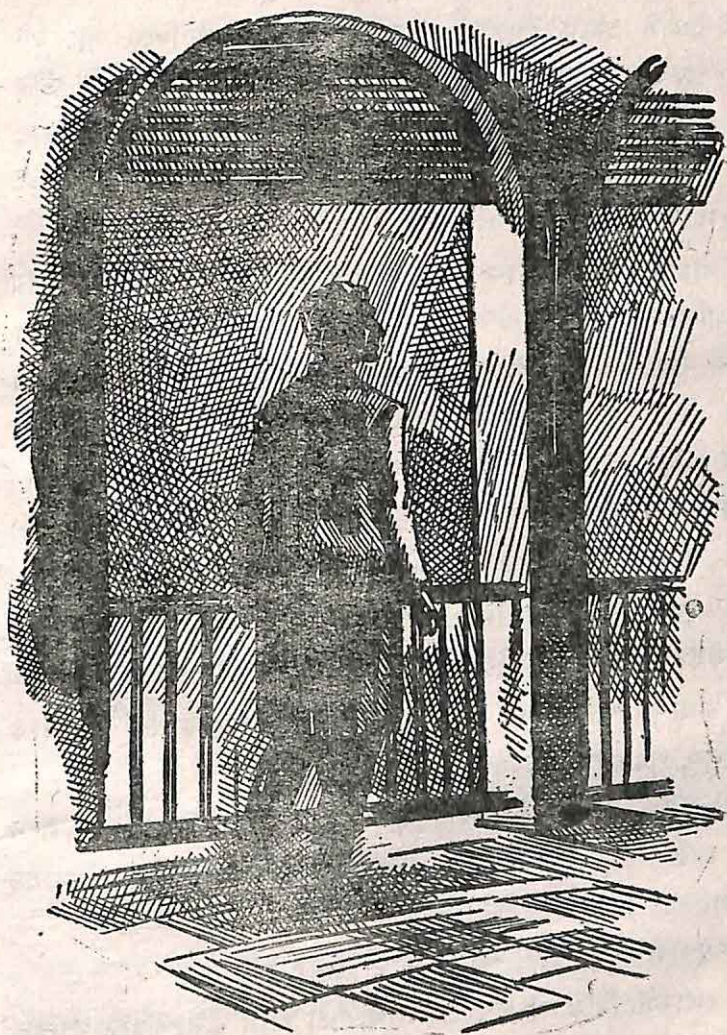
কোন রকমে ঝুলে আছেন, এমন সময় টের পেলেন কে তাঁর মেরজাইয়ের পকেট হাতড়াচ্ছে। ফিরে দেখেন, কালো কুচকুচে রোগা টিংটিঙে এক ছোকরা কিচ্ছু না ধরে ঝুলে রয়েছে। পণ্ডিতমশাই এমনি চমকে গেলেন যে ছাতার বাঁট ছেড়ে দিয়ে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমন সময় শূন্যে ঝোলা ছোকরা তাঁর হাত ধরে আবার ছাতায় লটকে দিল। পণ্ডিতমশাই বললেন, "মন তোমার এত ভালো, তবু লোকের পকেটে হাত গলাও কেন?"

সে ফিক করে হেসে বলল, "কি করব, অবেবস!"

আরেকজন ভদ্রলোক ঝম-ঝম বিষ্টি মাথায় নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এক গলি দিয়ে বাড়ি চলেছেন। হঠাৎ সামনে দেখেন এক পাল ছাগল নিয়ে একটা লোক যাচ্ছে। দুজনেই ভিজে চুপ্পুড়, এমন সময় একটা পোড়ো বাড়ি দেখা গেল। ভদ্রলোক শুনেছিলেন এই রকম বাড়িই লোকের ঘাড়ে ভেঙে পড়ে তাই একটু ঘাবড়াচ্ছিলেন। কিন্তু সেই লোকটা যখন দিব্যি নিশ্চিন্তে ছাগলের পাল নিয়ে পোড়ো বাড়ির দাওয়ায় উঠে পড়ল, তখন উনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। উঠে, গা থেকে জল ঝাড়া দিয়ে একটা বিড়ি ধরালেন। তাই দেখে লোকটির চোখ চকচক করে ওঠাতে, তাকেও একটা বিড়ি দিলেন।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে বিড়ি টানবার পর, ভদ্রলোক বললেন, "এ জায়গাটা কিন্তু ভালো নয়।"

লোকটি বলল, "ভালো তো নয়-ই। এ পাড়ার কেউ এখানে পা দেয় না। বিষ্টির জলে ভেসে গেলেও নয়। এ-বাড়ির বড় বদনাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।"

লোকটা বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, "তা আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।" এই বলে ছাগল-ভেড়া নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভদ্রলোকও জল ঝড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

ভবানীপুরে একটা পুরানো বাড়ি ছিল, ভাগে ভাগে ভাড়া দেওয়া। বাড়ির গিন্নির ছেলেপূলে ছিল না; স্বামীর সঙ্গে কেবলি ঝগড়া হত। আর ঝগড়া হলেই দুমদাম করে স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন আর সে-রাতে বাড়ি ফিরতেন না। এদিকে ভয়ে ভয়ে ভাবনায় গিন্নির প্রাণ যায়।

তখন তিনি তিনতলার রান্নাঘরের পাশে এক টুকরো খোলা ছাদে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, দেবতাকে ডাকতেন। হঠাৎ দেখতেন পাশের ভাড়াটেদের ছোট্ট ছাদে তিন-চারটে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুপুর রাতে মহা হুল্লোড় লাগিয়েছে। সঙ্গে আবার কতকগুলো কুকুর-বেড়াল। দেখে দেখে তাঁর মন ভালো হয়ে যেত।

ছেলেমেয়েগুলো টপাটপ মধ্যিখানের পাঁচীল টপকে, এদিকে এসে তাঁর কোলেপিঠে চাপত আর হিন্দীতে ইংরিজিতে মিশিয়ে কি যে না বলত তার ঠিক নেই। কোথায় নাকি ফলের বাগান আছে, ঝরনা আছে, আন্টিকে নিয়ে যাবে। ভদ্রমহিলাকে বলত আন্টি। তারপর একদিন ঐ বাড়ি ছেড়ে ওরা চলে গেলেন।

এর বছর কুড়ি বাদে, তখন স্বামীর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, গিন্নিও অনেক বেশি সুখী। হঠাৎ মনে হল সেই বাড়িটা একবার দেখে আসি। গিয়ে দেখেন ঘর-দোর আরো জীর্ণ হয়ে গেছে। ওদের সেই ঘরে এক বুড়ি থাকে।

সে বলল, "বড্ড একা লাগে। তবে পাশের বাড়ির এক গাদা ছেলেমেয়ে কুকুর-বেড়াল রাতে ভারি মজা করে।"

আর কৌতূহল রাখতে না পেরে, একটা টুলে চড়ে পাশের ছাদে চড়ে, উল্টো দিকে পাঁচীলের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখেন খাড়া দেওয়াল নেমে গিয়েছে, ওদিকে আর কোন ঘর নেই।

গায়ে কাঁটা দিল।

কলম সরদার

আমার ছোট ঠাকুরদা একদিন বললেন, ভূতফুত কিছু না। কেন যে পাঁচির মা রাতে ছাদে গিয়ে কালো কুকুরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ভয় পেল এ আমি ভেবে পেলাম না। ভূত আবার কি?

বুঝলি, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কলকাতা শহর ভোঁ, ভোঁ। রাতে পাড়ার মধ্যেও থমথম করে। বাড়িতে থাকলে বাইরে যেতে ভয় করে, বাইরে থাকলে অন্ধকারে খালি বাড়িতে ঢুকতে ভয় করে। ভয়টা শুধু জাপানী বোমার ভয় নয়। চুরি-ডাকাতি, নিখোঁজ হওয়া, সব রকম। ভয় ছিল লোকের। খানিকটা সত্যি, খানিকটা মন-গড়া।

সে একদিন গেছে। পাছে শত্রুদের বোমারু আলো দেখতে পেলে ঠিক জায়গাটিতে বোমা ফেলে, তাই আলো দেখানো বারণ ছিল। আলো দেখালে পুলিসে ধরত। সবার জানালা-দরজা বন্ধ, মোটা কালো পরদা দিয়ে ঘেরা, আলোর চারদিকে কালো কাগজের ঘেরাটোপ। শুধু বাতির তলায় একটুখানি আলো পড়ে, বাকি সব অন্ধকার। পড়াশুনো কাজকর্ম সকলের মাথায় উঠেছিল। রাত আটটার পর বাইরে বেরুতে হলে পারমিট দরকার হত।

তবে আমার কথা আলাদা। আমি নতুন পুলিসে ঢুকেছি, আমাদের সুদ্ধ মিলিটারি বানিয়ে দিয়েছে। জানিস্ নিশ্চয়, যারা নতুন পুলিসে চাকরি নেয়, তাদের দিয়েই সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ করানো হয়। কারণ দক্ষ দুঁদে লোক মরে গেলে বেশি ক্ষতি হয়।

সে যাই হোক, আমার উপর চব্বিশ ঘণ্টা কালীঘাটে খানা-তল্লাসীর ডিউটি পড়ল। কুখ্যাত চোর-গুণ্ডা কলম সারদারকে খুঁজে

বের করতে হবে। মেলা সোনাদানা নিয়ে সে ফেরারী হয়েছে, অথচ পুলিসের খবর যে সে শহরের মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। সম্ভবতঃ কালীঘাটে কি খিদিরপুরে, কি চেতলায়। এমনিতেই কলমের পিছু নেওয়া মানে প্রাণটি হাতে নিয়ে বেরুনো। তার উপর খাঁ-খাঁ খালি, কালীঘাট মানেই ভূতের হাট। সত্যি কথা বলতে কি আমি খুব সাহসীও ছিলাম না তখন। সঙ্গে একটা লোক পর্যন্ত দেয়নি আপিস থেকে।

সুখের বিষয় কলমের মোটা বেঁটে কদমছাঁট চুলওয়ালা চেহারা দূর থেকেও চেনা যেত, সাবধানও হওয়া যেত, বামাল ধরতে পারলে এখুনি প্রমোশন, নচেৎ এই অবধি—বলে আমাদের বড়সায়েব আমার দিকে একবার তাকিয়ে এক দাঁত কিড়ি-মিড়ি করলেন। আমি জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ স্যার, ধরে আনছি স্যার। বড়সায়েব আমাকে তিন দিন সময় দিলেন।

আসলে কালীঘাটে তদন্ত করতে আমার খুব বেশি আপত্তি ছিল না। ঐখানে খালের ধারে আমার বন্ধু জগার বাড়ি। বাড়ির বাকি সবাই ঘাটশীলায়; ছিল শুধু জগা আর তার রাঁধুনে বামুন শঙ্কর, যার রান্না একবার খেলে আর ভোলা যায় না। ঠিক করলাম ওদের বাড়িটাকেই তদন্তের হেড্‌কোয়ার্টারস্ করতে হবে। কলমকে সঙ্গে না নিয়ে আর আপিসমুখো হওয়া নয়।

পথের আলোয় ঘেরাটোপ দেওয়া, কিছুই দেখা যায় না। প্রায় অনেকটা আন্দাজে তদন্ত চলল। তবে কলম নিজেও নিশ্চয় ভারি নিরাপদ মনে করে খানিকটা অসাবধান হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া আমিও একরকম অদৃশ্যভাবেই চলাফেরা করতাম। আগাগোড়া কালো পেশাক, পায়ে কালো রবারের জুতো মাথায় তখন কালো কুচকুচে চুলও ছিল। জুতোর জন্যে প্রায় নিঃশব্দে চলি। রাত হয়তো একটা হবে, রাস্তার মিটমিটে আলোয় চমকে দেখি আমার

হাত পাঁচেক সামনে যে হন্‌হনিয়ে চলেছে সে যে কলম সরদার, সে বিষয়ে কোনো ভুল হতে পারে না।

সামনেই প্রকাণ্ড পুরোনো বট-অশ্বত্থে ছাওয়া আমলা-বাড়ি। পঞ্চাশ-ষাট বছর সেখানে কাউকে বাস করতে দেখা যায় নি। জগা বলে—বাড়িটার বড় বদনাম, দিনের বেলাতেও কেউ সেখানে যায় না কলম দেখলাম স্বচ্ছন্দে তার ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বলা বাহুল্য আমিও ঢুকলাম। ঘাস-গজানো খানিকটা কাঁকরের পর, তারপরেই নড়বড়ে গাড়িবারান্দা দেওয়া বিশাল বাড়ি। সেদিকে তাকালে গা শির-শির করে।

মধুমালতীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, কলম পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ আর লম্বা চাবি বের করে, সদর দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল, দরজাটা আধ-ভেজানো রইল। বেজায় ঘাবড়িয়ে গেলাম। টর্চ জ্বাললেই ও দেখতে পাবে। না জ্বেলেই বা যাই কি করে, এদিকে হাত-পা তো পেটের মধ্যে সেঁদিয়েছে। ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় কাঁধের কাছে থেকে কে যেন বলল, "কি মুস্কিল এটা কি থামবার সময় হল? সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়তে হয়, নইলে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দেবে আর ধরতে পারবে না। তারপর বড়সায়েব যখন—"

আঁৎকে উঠলাম, ব্যাটা এত কথা জানল কি করে? নিশ্চয় স্টোফানো সাহেব আমাকে অবিশ্বাস করে আমার উপর চোখ রাখার জন্যে গুপ্ত-গোয়েন্দা লাগিয়েছে। যত না রাগ হল, তার চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, ভূতের বাড়িতে তাহলে একা ঢুকতে হবে না। সে বললে, "আবার কি হল? চল, চল, এক মিনিটও নষ্ট করার নয়। আমার পিছন পিছন এসো।"

একরকম বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়লাম। ভীষণ অন্ধকার। কলম নিজেকে নিরাপদ ভেবে বেশ দুমদাম শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তিনতলায় তার টর্চের আলো দেখতে পেলাম। লোকটা বলল, "এই রে, ছাদের নিচের চোরা-কুঠরিতে সেঁদিয়েছে। তা যাক। সিঁড়িটা না তুললেই হল।" ঠুক করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ তারপর চুপচাপ, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

লোকটা বলল, "তোমার সঙ্গে আলো নেই?" এবার নিশ্চিন্তে টর্চ জাললাম। যতটা সম্ভব ভালো করে গুপ্তগোয়েন্দাকে দেখে নিলাম। কালো তাল ঢ্যাঙ্গা, কপালের মাঝখানে তিলকের মতো কাটা দাগ; পরনে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া, ধুতি, গলায় পৈতে, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বাড়িময় তিন ইঞ্চি পুরু ধুলো জমেছে, তাই লোকটার চটির শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না।

ধুলোর নীচে মনে হল মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। নিঃশব্দে তিনতলায় উঠলাম। লোকটা আমাকে হলঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাদের কড়িকাঠে ঠেকানো লম্বা একটা কাঠের মই দেখিয়ে দিল। ছাদটা প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচুতে হবে।

লোকটা বলল, "মইয়ের মাথায় ঐ চোরা-কুঠরি। ভালো করে দেখ ঐখানে গোল ঢাকনির মতো দরজা ছাড়া আর পথ নেই। তবে ঘুলঘুলি দিয়ে হাওয়া ঢোকে, দম আটকেও মরে যাবে না। চটপট সিঁড়ি বেয়ে ওঠ দেকিনি। কড়িকাঠের আড়ালে হুড়কো আছে। ওটি টেনে দিলেই খাঁচা বন্ধ। তারপর থানা থেকে লোকজন বন্দুক এনে ধরে ফেললেই হল।"

আমি বললাম, "বড্ড উঁচু যে। ইয়ে আপনার সব চেনা জানা, আপনি উঠলেই ভাল হত না?" লোকটা মুখ চেপে হাসতে লাগল। "কি যে বল! আমি উঠব ঐ সিঁড়ি বেয়ে, তবেই হয়েছে। নাও, নাও, উঠে পড়, শেষটা বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।"

সত্যিই উঠলাম, হুড়কোও টানলাম, সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে চোরা দরজার উপর ভারী কিছু পড়ল। ভয় পেলাম, ভাঙবে না তো?

"আরে না, না, লোহার তৈরি। এবার নেমে এসে সিঁড়িটা নিয়ে নিচে চল। পঁচিশ ফুট উঁচুতে থাকুন বাছাধন!"

মই কাঁধে তার সঙ্গে একতলায় এসে সিঁড়ির পিছনে মই রাখলাম। তারপর সদর দরজা দিয়ে বাইরের আবছা অন্ধকারে এলাম। লোকটাও বেরিয়ে এসে, দরজাটাকে ঠেলে ভেজিয়ে দিল। তারপর বলল, "চল থানার দিকে এগুনো যাক।"

আমি বললাম, "আচ্ছা স্যার, চোরা-কুঠরির কথা জানলেন কি করে? এখানে আরো এসেছেন নাকি?" সে খুব হাসল। "আসি নি আবার। হাজারবার এসেছি। তোমার সাহায্য ছাড়া ব্যাটাকে ধরতে পারছিলাম না। এবার বুঝুক ঠেলা!"

"কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনিও কি পুলিসের গুপ্ত গোয়েন্দা?"

সে বেজায় রেগে গেল। "গুপ্ত গোয়েন্দা? আরে ছো ছো! আমি সর্বদা পুলিস-ফুলিস এড়িয়ে চলি। ফুলিস বললাম বলে আবার চটে যেও না যেন। তুমি কিন্তু বেশ চালাক?" একটু খুসি না হয়ে পারলাম না। "তবে কি কলম আপনার জিনিসই সরিয়েছে নাকি? নাকি আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

ততক্ষণে থানায় পৌঁছে গেছি আমরা। লোকটি বলল, "মোটেই না। ব্যাটাচ্ছেলে কাগজ না কলম সে খবরও রাখি না, আর লোকে যদি নিজেদের জিনিস নিজেরা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে নিলে আমার কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের বোষ্টমবাড়িতে দু'বেলা মটন চপ আর পাঁঠার ঘুঘনি সাঁটাবে, এ আমার সহ্যের বাইরে।"

এই বলে লোকটা আমার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; থানার ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখলাম। আমিও ঝুপ করে মূর্ছা গেলাম। পরে শুনলাম বামাল কলম গ্রেপ্তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে ধরলেন? আমি তো কিছু না বলেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।" থানার ও-সি বললেন, "কেন, আপনাকে পড়ে যেতে দেখে কে একজন লম্বা কালো ভদ্রলোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সব কথা বললেন। আমাদের লোকও তখুনি বেরিয়ে গেল। বেশ মজার ভদ্রলোক, আপনার যথেষ্ট যত্ন হচ্ছে না বলে খুব রাগ দেখালেন। বললেন, 'ষাট বছর আগে হলে এরকম অযত্ন হত না।' ওই বলে হন-হন করে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।"

দরজার কাছ থেকে থানার বুড়ো চৌকিদার বলে উঠল, "দেখবেন কাকে স্যার? ও কি দেখার মানুষ? পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ভূতের বাড়ি আগলাচ্ছে, ও কি যে-সে নাকি? কপালে একটা কাটার দাগ ছিল তো?"

আমি বললাম, "ছিল, ছিল!" বলে আবার মূর্ছা যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার খাবার এল।

ছায়া

তাসজোড়া বাক্সে পুরতে পুরতে ডাক্তারবাবু বললেন, "তা বললে তো আর হবে না, গোপেনবাবু, সব জিনিস যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এত লোকে দেখেছে, সবাই কি আর মিথ্যে কথা বলে?"

গোপেনবাবু নরম গলায় বললেন, "না, ঠিক তা বলছি নে, তবে কি জানেন, আত্মার যদি অসীম স্বভাব হয় তবে তার একটি সীমাবদ্ধ রূপ কি করে দেখা যাবে?"

চৌধুরীমশাই বললেন, "সীমাবদ্ধ রূপ আবার কি? আত্মার বিস্তার যেমন অসীম তার ক্ষমতাও তেমনি অসীম, একটা সীমাবদ্ধ রূপ নেওয়া তার পক্ষে কিছু শক্ত কাজ নয়।"

দানু বললে, আর রূপও নিচ্ছে না এক্ষেত্রে, শুধু একটু ছায়া নিচ্ছে, ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না, ভেতর দিয়ে গঙ্গার ওপারের গাছ দেখা যায়, চাই কি ওর মধ্যে দিয়ে হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।"

চৌধুরীমশাই শিউরে উঠে, গায়ের চাদরটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

"আসলে কি জানেন গোপেনবাবু, বিয়েথা তো আর করলেন না, তাই সব জিনিস যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান। পৃথিবীতে যে এমন বহু জিনিস আছে যার সামনে যুক্তিতর্ক খাটে না, এ অভিজ্ঞতা আপনার হবে কোত্থেকে?"

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"চলি, গোপেনবাবু আমার বাড়িতেও কেউ রাত করার যুক্তি মানতে চায় না। কিন্তু আপনার ঐ অসীমের কথাটার মধ্যে যে কিছু নেই তাই বা বলি কি করে। তবে কি জানেন, ছ'ফুট লম্বা মানুষটার

ফটোও তো চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি কাগজে ধরে যায়। অবিশ্যি সে ছবিটা কিছু আর আসল মানুষটা নয়, তার হুবহু ছায়াটুকু ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি কালের পটেও হয়তো বিশেষ অবস্থায় ঘটনার আর পাত্র-পাত্রীর ছাপ পড়ে যায়, আবার সেই বিশেষ অবস্থা ঘটলে ফটোর মতো সেগুলো দেখা যায়। বলা যায় না কিছুই। চল দানু।”

দানু গলায় কম্ফর্ট জড়াচ্ছিল, পাড়ায় ভালো গাইয়ে বলে তার সুনাম, পূজোর সময় সখের থিয়েটারে তাকে গাইতে হবে, কাজে কাজেই সাবধানের মার নেই। তাছাড়া এদের যা কথাবার্তা এমনিতেই কেমন গাটা শির-শির করতে আরম্ভ করছে। জোর করে হেসে দানু বললে, “ভূত নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলুন গোপেনবাবু? তার চেয়ে স্মাগলারদের সম্বন্ধে সাবধান হোন, দেখেছেন তো কাগজে কি লিখেছে, মেয়ে লাগিয়েছে নাকি আর এই সব জায়গাতেই কোথাও স্মাগলারদের আড়ত। মাঝ-গঙ্গায় জাহাজ নোঙর করে সোনাদানাগুলোকে জলে ডুবিয়ে দিলেই হোল। গভীর রাতে সাঙ্গাতরা নৌকা করে গিয়ে জল থেকে সেগুলো উঠিয়ে এনে পাচার করে দেয়। ব্যস্ আর কি চাই!”

চৌধুরামশাইও খুব হাসতে লাগলেম।

“আরে, জলেও ফেলে না; এই তো শীতের হাওয়া দিতে শুরু হোল বলে, ওরা এখন জলে ডুব দিল আর কি, তুমিও যেমন! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, বয়ার তলায় শেকলের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়। গিঁট খুলে নিয়ে গেলেই হোল। তবে পুলিসও এতদিনে শুঁকে শুঁকে সব বের করেছে; তারাও এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে যাচ্ছে, হাতে-নাতে এক ব্যাটাকে ধরতে পারলেই হোল, জেরা করে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিতে পারবে।”

ডাক্তারবাবু বললেন, “এদের যেমন কথা! কিন্তু বাস্তবিকই

একটু সাবধানে থাকবেন গোপেনবাবু, দুষ্টু লোকের কিছুই বলা যায় না। বে-আইনি কাজ করে শেষটা ওদের মনটা এমন হয়ে যায় যে দুটো-একটা খুনখারাপিতে কিছুই বাধে না। তার ওপর একেবারে একা থাকেন তো! আপনার কি মশাই এক-আধটা পুরনো চাকরও থাকতে নেই? এখানকার লোক যে মরে গেলেও এ বাড়িতে রাত কাটাবে না সেটা মানি।"

গোপেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "পুরনো চাকর তো সঙ্গেই এনেছিলাম, তা সে কিছুতেই গঙ্গার এতটা কাছে থাকতে রাজি হোল না। গঙ্গার গন্ধে নাকি তার হাঁপানি বাড়ে। একটা রাত মোটে ছিল।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "গঙ্গার গন্ধ-ফন্ধ কোনো কাজের কথা নয়, আসলে আপনার ঐ মালী-মজুররা স্রেফ তাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়েছে। বুদ্ধির কাজ করেছে। আপনি তো আর ভালো কথা শুনবেন না। পই-পই করে বলছি, আমার ছোট বাড়িটাতে উঠে আসুন, ঐ রাঁধুনেই রাঁধবে, গঙ্গার ঐ স্যাৎসেঁতে হাওয়া থেকেও রেহাই পাবেন, চাই কি পুরনো চাকরটাও ফিরে আসতে পারে। মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া। তা ভালো কথা কে শোনে?"

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে পর, ছোট ফটকে তালা দিয়ে, মোটা আমেরিকান তারের জাল ঘেরা বারান্দায় তালা দিয়ে গোপেনবাবু গঙ্গার ধারের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। আসলে ঐ একই বারান্দা, গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, আগাগোড়া তারের জালে মোড়া। আগে নাকি জোয়ারের সময় দু'একবার মানুষ-খেকো কুমিরকে একেবারে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যেত, তাই এই ব্যবস্থা। গোপেনবাবু কেনবার আগে ত্রিশ-চল্লিশ বছর নাকি বাড়িতে বড় একটা কেউ বাস করে নি। বড় জোর একটা রাত কি দুটো রাত।

বারান্দার বাইরে রং-বেরঙের ভাঙ্গা চীনেমাটির বাসনের টুকরো বসানো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চাতাল। এক কালে এখানে ফোয়ারা থেকে জল বেরুত, ফোয়ারার চারধার বাঁধানো, গোটা দুই পাথরের বেঞ্চিও রয়েছে।

বারান্দা থেকে গোপেনবাবুর মনে হতে লাগল ফিকে তারার আলোয় একটা বেঞ্চির কোণায় কে বসে রয়েছে। সারা গায়ে সবুজ কাপড় জড়িয়ে, পাৎলা ছিপ-ছিপে একটি মেয়ে যেন গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

গোপেনবাবুর ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে এই প্রথম তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল। মনে হচ্ছে যেন এক ঢাল ভিজে চুল মাথার ওপর জড়ো করে রেখেছে, কানে গলায় গয়না চিকচিক করছে, গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ। তারার আলোতে সত্যি কতখানি দেখছেন আর কতখানি কল্পনা করে নিচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির পাশে বেঞ্চির ওপরে রাখা আধ হাত লম্বা একটা কালো বাক্সও চোখে পড়ল।

এতক্ষণে গোপেনবাবুর চৈতন্য হল। তাইতো চোরাকারবারীরা তো এই রকম সব সুন্দর মেয়েদেরই কাজে লাগায়। কথাটা তো তাঁর অজানা নয়; সত্যিই তো এ মেয়েকে কখনো কেউ সন্দেহ করতে পারে না, একটা কোমল শ্যামল লতার মতো বেঞ্চির ওপর হাল্কা শরীরটা কেমন এলিয়ে রয়েছে। এতখানি দূর থেকে তার মাধুরী টের পাচ্ছেন গোপেনবাবু, কিসের একটা মৃদু সুগন্ধও যেন নাকে আসছে।

হাতে একটা বন্দুক নেই, লাঠি নেই অমনি বারান্দার জালে বসানো ছোট দরজাটির ছিটকিনি খুলে গোপেনবাবু বাইরে এলেন। মোটাসোটা ফর্সা মানুষটি মাথার চুল পাৎলা হয়ে এসেছে, নাকের ওপর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা বসানো, চোখটা দিন দিন যেন

আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কে জানে কাছে গিয়ে হয়তো দেখবেন সব ভুল, কি দেখছেন আর পাঁচ রকম গল্প শুনে কি মনে করে বসে আছেন! ওখানে সত্যি কারো থাকার সম্ভাবনা কম, পথ তো শুধু গঙ্গা, নয়তো দু'ফুট উঁচু পাঁচীল টপকানো। তাছাড়া এ এলাকার কেউ রাত এগারোটার সময় যে এ বাড়িতে আসবে না সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। তবে এ এলাকাতে যারা থাকে তারা হল সব আটপৌরে মানুষ। অমন মেয়ে এখানকার হবে কেন?

বারান্দা থেকে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে, চাতালে বসানো এক মানুষ উঁচু লাল গোলাপের গাছের সারি পার হয়ে শুকনো ফোয়ারার ধারে এসে দেখেন যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই, বেঞ্চিতে কেউ বসে নেই।

কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এল। তবে কি গোপেনবাবু মনে মনে চেয়েছিলেন যে, ঐখানে ওই রকম একটি মেয়ে সত্যি থাকুক? ওরকম মেয়ে হয় কখনো? ও তো চল্লিশ-বছর ধরে দেশী বিদেশী কাব্যে পড়া যত সুন্দরী তাদের রূপরস দিয়ে মনগড়া একটি ছবি, একটা ছায়া, কি যেন বলছিল দানু ওর মধ্যে দিয়ে চাই কি হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু কি একটা অনভ্যস্ত সুগন্ধে, বাতাসটা তবে কেন ভারী হয়ে আছে? গোপেনবাবু চারদিক চেয়ে দেখলেন গন্ধরাজের ঝোপের গাঢ় সবুজ ছায়া থেকে খানিকটা ফিকে সবুজ যেন আল্লা হয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ তাকে এতটা কাছে দেখে গোপেনবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

মেয়েটি একটু ম্লান হেসে বললে, "বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন। এটা লুকিয়ে রাখুন।" বলে বুকে আঁকড়ে-ধরা কালো বাক্সটি পরম নিশ্চিন্তভাবে গোপেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

গোপেনবাবুর কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না, অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায়

বললেন, 'কি—কি আছে ওতে ?"

সে খিল-খিল করে হেসে উঠল, সে হাসি গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে গঙ্গার বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই, কে জানে পুলিসরা কোথায় ওর সন্ধানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। চোরাকারবারী গোপেনবাবু আগে কখনো চোখে দেখেন নি, তাই ভালো করে তাকে দেখলেন। ইস্, এরা এত রূপসীও হয়! চোখে ধাঁধা লেগে যায়। কপাল ঘিরে বেঁটে বেঁটে ভিজে কোঁকড়া চুলে গুছি, দু'কানে দুটি সবুজ পাথর, তারার অলোয় ঝিকমিক করছে, পাৎলা পাখির ডানার মতো ভুরু, কি যে সূক্ষ্ম কি যে মসৃণ, জোরে কথা বলতে ভয় করে। অথচ ওরই ওই আধভিজে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কোথাও একটা মুখ-কাটা ভোঁতা বন্দুক লুকিয়ে আছে। অব্যর্থ টিপও নাকি চোরা-কারবারী মেয়েদের, দানু কোন কাগজে নাকি পড়েছে। এর হাতের আঙ্গুলগুলো সত্যি সত্যি চাঁপার কলির মতো, একটা আঙ্গুলে এই বড় একটা সবুজ পাথর-বসানো আংটি।

খুসি হয়ে কেন লোকে পাপ করে, কিসের জন্য নরকে যাওয়া সার্থক মনে হয়, সে রহস্য হঠাৎ গোপেনবাবু বুঝে ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বাক্সটি ধরলেন। এত ভারী যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল।

মেয়েটি খুব কাছে এসে হেসে বললে, "খুব ভারী, না? খুলেই দেখুন না এত ভারী কেন ?"

বলে বাক্সের ডালা নিজেই তুলে দিল। বাক্সভরা সোনার মোহর। সে বললে, "একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখুন কেমন ?" বলে এক মুহূর্তের জন্য গোপেনবাবুর হাতের কব্জির ওপর নরম কচি আঙ্গুল রাখলে।

গোপেনবাবুর কান ঝিমঝিম করতে লাগল, ভাবলেন একেই

বোধহয় সুখমৃত্যু বলে। পর মুহূর্তেই মেয়েটি অনেকখানি দূরে সরে গেল। বলল, "ওগুলো আমার নয়। পরে গোলমাল চুকে গেলে, বনানী দেবী, বনহুগলী এই নামে পাঠিয়ে দেবেন কেমন?" কিছু বলতে পারলেন না গোপেনবাবু। ঐকদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। সে একটু একটু করে সরে যেতে লাগল, দেখতে দেখতে এতটা তফাতে চলে গেল যে, এই তার সবুজ সাড়ি গাছের সারির সঙ্গে মিশে যায়, আবার এই যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তারপর গঙ্গার ধারের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়ের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল, আর তাকে আলাদা করে দেখা গেল না।

গোপেনবাবু বাক্স নিয়ে ঘরে এলেন। মাথার ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার, কোথায় লুকোতে হবে আর বলে দিতে হল না। চাতালের সিঁড়ির পাশেই পাতাবাহারের চীনেমাটির টব সরিয়ে ছোট্ট খুপরি দিয়ে গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বাক্স পুঁতে যত্ন করে মটে চাপা দিয়ে টবটি আবার যথাস্থানে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে শুয়ে পুলিসের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এল তারা ঠিকই, ঘণ্টা দুই পরেই, সঙ্গে তাদের চৌধুরীমশাই, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাণ্ডা তিনি, এসব ব্যাপারে বাদ পড়েন না। বড় ফটকের ঘণ্টা দিয়ে একটু লজ্জিতভাবে এসে দুটো একটা মামুলী প্রশ্ন করল শুধু।

"জিগ্‌গেস করতে হয় বলে কচ্ছি স্যার, নইলে এদিকে যে কারো নদীর দিক থেকে আসা সম্ভব নয়, সেটা আমরা খুব জানি। নদীতেও আমাদের লোক আছে যে। তবে মেয়েছেলেরা কত্তে পারে না এমন কাজ নেই, তাই একবার খোঁজ কত্তে আসা। আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুন গে। জালের দরজায় তালা দেন আশা করি? এ গাঁয়েরই কারো কারো সঙ্গে ওদের সড় আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনভাবে সোনাদানা চালান হয় যে, বে-আইনি বলে

ধরে কার সাধ্যি! চলি স্যার।"

তারা গেলে পর দরজায় তালা দিয়ে গোপেনবাবু শয্যা নেবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগে থাকল।

পরদিন সকালে রাধেশ্যাম এসে চা টোস্ট নিয়ে গোপেনবাবুকে ডেকে তুলল। তার কাছে খিড়কি দোরের চাবি থাকে। চোখের কোলে তার কালি।

"কি হোল রাধেশ্যাম?"

সে বললে, "কাল রাতে গাঁয়ে কেউ ঘুমোয় নি বাবু, সারারাত খানাতল্লাসি চলেছে। আমিনদের বাড়িতে মেয়েছেলেটি ধরা পড়ে গেছে। তক্তাপোষের নিচে সোনা। তাই দেখতে গেলাম, কি সোঁদর, মাইরি। কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছিল।"

গোপেনবাবুর হাতখানি কাঁপছিল, অনেক যত্নে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, "সোনা হয়তো আর কেউ এনেছে? ও মেরে আনবে কেন?"

"সে তো তাই বলছে। সে নাকি কিচ্ছুটি জানে না। এমনি বেড়াতে এসেছিল, আমিনের ঠাকুমা ওর ধাইমা ছিল, হেনাতেনা কত কি। খুব কাঁদছিল মেয়েটা। ঐ দেখুন লরি এলো, ওকে থানায় নিয়ে যাবে। কি হোল গো, বাবু?"

গোপেনবাবু পেয়ালা ফেলে আথালি পাথালি ছুটে চললেন। কাঁদছে মেয়েটা? হয়তো ভাবছে গোপেনবাবুই খোঁজ দিয়েছেন। কেমন অসহ্য লাগল ভাবনাটা। লরির কাছে পৌঁছে দেখেন লাল নীল কাপড়-পরা, এক গা সোনার গয়না পরে, ঠোঁটে গালে রং মেখে লম্বা চওড়া এ কোন মেয়েকে তোলা হচ্ছে? আঃ, বাঁচা গেল।

রুমাল দিয়ে হাসি চেপে গোপেনবাবু ঘরে ফিরে রাধেশ্যামকে নতুন করে চা আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দানুকে নিয়ে চৌধুরী-মশাইও এসে উপস্থিত, চুল সব উস্কোখুস্কো, উত্তেজনায় ফেটে

পড়ছেন। দানু বসে পড়েই বললে, "শেষটা গেলি তো বাছা ফটকে? মেয়েছেলে হয়ে এসবে ঢোকা কেন! চা খাওয়ান গোপেনদা।" চৌধুরীমশাই পা তু'খানি মেলে দিয়ে বসলেন।

দানু বললে, "যাক, আপনার একটা বিপদ ঘুচল। চোরাকারবারী মেয়ে ধরা পড়ল। এবার ভূত হতে সাবধান।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "না, ঠাট্টা নয়, রাত্রে এমনিতেই গা ছমছম করে, তাই কাল আর কিছু বলিনি, কিন্তু এ বাড়ির তুর্নাম কি একেবারে মিছিমিছি হয়েছে ভেবেছেন? এটা জগু বোসের বাগানবাড়ি ছিল তা জানেন? দেউলে হোয়ে জগু বোসও ম'ল, কে এক সুন্দরী বাইজি বাক্সভরা মোহর নিয়ে নিখোঁজ হোল, সেও প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর হোতে চলল। জগু বোসের বৌ বনানী দেবী এখনো বেঁচে। নাকি বনহুগলীতে বুড়ো বয়সে একরকম না খেয়ে দিন গুনছে।"

শিরার মধ্যে রক্ত-চলাচল বুঝি থেমে যায়। নাকি, ছবি, নাকি ছায়া, ওদের মধ্যে দিয়ে নাকি হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

নিঝুম তুপুরে নির্জন চাতালের ধার থেকে টব সরিয়ে বাক্স তুলে তুলো দিয়ে এঁটে প্যাক করে, চটে সেলাই করে, গোপেনবাবু কলকাতায় এসে বড় পোস্টাপিস থেকে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বনহুগলীতে রেজিস্টার্ড পার্সেল পাঠালেন। ফিরবার সময় তিনটে বেকার উড়নচণ্ডে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কাজকর্ম না শিখলে চলে কখনো?

রাত্রে

নীলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে চুরি হবার দু'মাস পরে বিশে গিয়ে ধরা দিল। ততদিনে খোঁজ-খোঁজ রব অনেক কমে এসেছে, কেন যে বিশে ধরা দিল কেউ ভেবেই পায় না।

"বাবু, আমাকে এখন থেকেই গারদে পুরে রাখুন। অতগুলো গয়নাগাঁটি চুরি করেছি, আমাকে ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।"

থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু ওকে পাগল ঠাওরালেন। এক সঙ্গে অত সোনাদানা পেয়ে ব্যাটার চোখ ঝলসে নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে গামছায় বাঁধা অমন রাশি-রাশি হীরে-মণি দেখে ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নিজেরই সৎজীবনের উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল, আর এ লোকটা বলে কি!

"বাবু, আমি কিচ্ছু চাই না, খালি আমাকে এখুনি ফাটকে দিন। অনুতাপ? না বাবু, অনুতাপ-টাপ আমার হয়নি। আমার এখনো মনে হয় যেরো ঐরকম অসাবধান, তাদের জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলাই উচিত। তাছাড়া আমরা যদি চুরিচামারিই না করব তবে আপনাদের চাক্‌রীরই বা কি অবস্থা হবে? সেজন্য নয় বাবু; আমার উপর দয়া করে আমাকে হাজতে দিন। দেখুন আমি মোটেই ভালো লোক নই। তাছাড়া কী আর বলব বলুন, এরপর আমি কথনো একা-একা অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়াতে পারব না, এখানে-ওখানে নির্জন জায়গা দেখে গা ঢাকা দিতে পারব না, খালি বাড়িতে রাত কাটাতে পারব না।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু অবাক হয়ে দেখলেন বিশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। একটা টুলে তাকে বসিয়ে বারবার

বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল দিকি—কোনো ভয়ের কারণ নেই।"

কাষ্ঠহাসি হেসে বিশে বললে, "ভয়? ইনস্পেক্টরবাবু ভয়ের কথা বলছেন? তবে শুনুন: ঠিক দু'মাস হল গয়নাগুলো নিয়েছিলাম। একা হাতেই কাজ সেরেছিলাম। একতলায় গয়নাগাঁটি রেখে কেউ দোতলায় ঘুমোয় বলে শুনেছেন? তায় আবার বাজে তালা দেওয়া সস্তা খেলো একটা লোহার সিন্দুক। ওঁদের একটু দয়া করে বলে দেবেন তো গয়না-গাঁটিতে কিছু কম পয়সা খরচ করে, সিন্দুক একটা ভালো দেখে কিনতে।

পরের জিনিস কখনো চুরি করেছেন? পালিয়ে বেড়ানো কাকে বলে জানেন? যাকে দেখি তাকেই মনে হয় শত্রু, বন্দুবান্ধবকেও মনে হয় বিশ্বাসঘাতক, কোথাপ নিশ্চিন্ত হবার যো থাকে না. নিরাপদ একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। যাই হোক, একদিন এখানে দুদিন ওখানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। উঃ, বলিহারি আপনাদের পুলিসদের বুদ্ধি! কতবার যে তাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে এসেছি, একবার, পথ বাতলে দিয়েছিলাম পর্যন্ত। বয়সও হচ্ছে আজকাল, ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। একদিন দুপুররাতে আমাকে ধরে ফেলেছিল আরকি। ছুটতে ছুটতে আমার দম বেরিয়ে গেছে, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কোথায় যাই? সামনে দেখি একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তার সদর দরজা একটুখানি খোলা।

ঢুকে পড়ে সেটাকে ঠেলে বন্ধ করে তাতেই ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। ভাঙ্গা জানলা দিয়ে একটু একটু রাস্তার আলো আসছে। এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকারে যখন চোখ অভ্যাস হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম এটা খালি বাড়ি। আঃ! কি আরাম যে লাগল বাবু, সে আর কি বলব! একটি রাত অন্ততঃ নিশ্চিন্তে ঘুমোন যাবে, কে জানে হয় তো দু'চারদিন এখানে এই খালি

বাড়িতে লুকিয়ে থাকাও যাবে। এখানে আবার কে আমার খোঁজ করবে, আমি নিজেই আবার ও জায়গাটা খুঁজে পাব কিনা সন্দেহ। হেঁটে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে পায়ের গুলিছুটো দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছে, ছুটো দিন একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে।

আস্তে আস্তে দরজার খিল তুলে দিলাম। দেশলাই জ্বালতে সাহস হ'ল না যদি ভাঙ্গা জানলা দিয়ে দেখা যায়। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। বহুদিন কেউ এখানে থাকে নি, চারদিক ধূলোয় ধূসর। আশ্চর্য হলাম ভেবে রেফিউজিরা কেন এটাকে দখল করেনি। বোধহয় খুঁজে পায় নি। কোথাও কিচ্ছু নেই। একেবারে খালি বাড়ি।

কাঠের সিঁড়ি মাঝে মাঝে ক্যাঁচ কোঁচ করে ওঠে, তা ছাড়া চারদিক একেবারে নিঝুম। তিনতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে ঘুরঘুটে অন্ধকার, জানালার খড়খড়ি সব এঁটে বন্ধ করা, একটুও আলো আসে না। সাহস করে দেশলাই জ্বেলে সামনের বড় ঘরটাতে ঢুকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল শুনতে পেলাম। পকেট থেকে মোমবাতির টুকরো বের করে জ্বাললাম। মস্ত খালি ঘরে শুধু একটা বড় তক্তপোষ, বিশাল উঁচু ছাদ। কাঠের জানলা-গুলো ভাল করে বন্ধ করা। মোমবাতিটা তক্তপোষের উপর নামিয়ে, গামছা দিয়ে তক্তপোষটা ভালো করে ঝেড়ে নিলাম।

তারপর পা ছু'খানি মেলে তার উপর বসে পড়লাম। সে যে কি আরাম সে অরে আপনি কি বুঝবেন!

গামছায় বাঁধা পুটুলিটি খুলে ফেলে তক্তপোষের উপর গয়নাগুলো ঢেলে ফেললাম। মোমবাতির আলোতে সেগুলো চিকমিক করতে লাগল। এই আমার এত ছুঃখের কারণ। এমন সময় পষ্ট শুনলাম

পায়ের শব্দ! পুলিসের লোক? কি বলব বাবু, বুকটা এমন জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে নিজের কানে সে শব্দ শুনতে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে কে উঠে আসছে। সামনের দরজায় আগল দিয়ে এসেছি। তবে কি পিছনে কোনও দরজা খোলা ছিল? সত্যি বলছি, সে যে বাইরে থেকে নাও আসতে পারে একথা আমার একবারও মনে হয় নি।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। গয়নাগুলো লুকিয়ে ফেলতেও ভুলে গেলাম।

পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে তিনতলায় এসে পৌঁছল, তারপরই ঘরের দরজার সামনে তাকে দেখতে পেলাম। সে যে কিরকম রূপসী, আমি মুখ্যু মানুষ, কথায় বোঝাতে পারব না। এই এক হাঁটু কালো কোঁকড়া চুল, সাদা পদ্মফুলের মত মুখখানি, টানা টানা চোখ-দুটি হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে, চাঁপাফুলের মতো হাত দিয়ে গায়ের উপর সাদা কাপড়খানিকে জড়িয়ে ধরেছে। বিধবা মনে হল। মাথায় সিঁদুর নেই, গায়ে গয়না নেই খালি রূপ দিয়ে, ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তাকে দেখে একেবারে হাঁ করে চেয়ে রইলাম, মুখে কথাটি সরল না। তাঁর চোখ দুখানি আমার কোলের কাছের গয়নার ঢিপির উপর পড়ল। অমনি তার মুখখানি ছলছলিয়ে উঠল, কাছে এসে আমাকে বললে, "ওমা! এত গয়না কোথায় পেলে?" দু'খানি ফর্সা হাত বাড়িয়ে গোছা গোছা গয়না তুলে ধরে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। "এর জন্য মানুষ খুন করে, পাপ করে, প্রাণ দেয়। ঈশ, এত গয়না কারো থাকতে পারে আমি জানতাম না। দেখি, দেখি, এ যেন চুনি পান্না গজমতি মনে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে দু'গাছা লম্বা মালা নিজের গলায় পরিয়ে দিল। দু'হাতে হাঙ্গরের মুখ দেওয়া বালা পরল, চুর পরল, আঙুলে আংটি

পরল। সেইখানে তক্তপোষের উপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে গা ভরে গয়না পরল। আমার কেমন যেন দশার মতো হ'ল কিচ্ছু বলতে পারলাম না। ভাবছিলাম যদি বাইরে থেকেই এল তো ওর চুল কাপড়-চোপড় ভেজে নি কেন?

তারপর আস্তে আস্তে যখন উঠে দাঁড়াল, ঠিক যেন দুগ্‌গো ঠাক্‌রুন। আমায় বললে, "একটি অয়েনা দিতে পার?" আমি মাথা নাড়লাম। "আয়না নেই? সে কি কথা! তবে আমি কোথায় আয়না পাব?" চারদিকে একবার তাকাল, তাপর দরজার দিকে চলল। তখন আমার চৈতন্য হল। ছুটে গেলাম তার পিছন পিছন, "কোথায় যাচ্ছেন মা-ঠাক্‌রুন আমার গয়না নিয়ে?" সেও ছুটে দরজা দিয়ে বেরোল, আমিও তার পিছন পিছন দৌড়লাম। সিঁড়ির মাথায় ধরে ফেলি আর কি। এমন সময় মাথা ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। মুখখানি যে কি হতাশায় ভরা! তারপর সেইখান থেকে সিঁড়ির নিচু রেলিং-এর উপর দিয়ে এক লাফ দিল।"

বিশে দু'হাতে কান ঢেকে বলল, "বাবু সে পড়ার শব্দ এখনও আমার কানে লেগে আছে। তারপর সব যখন চুপ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে পুঁটলিটা বেঁধে মোমবাতি হাতে করে নিচে নামলাম। এখানে আর নয়, শেষে কি খুনের দয়ে পড়ব!

নিচে এসে দেখলাম চারদিকে গয়নাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে, সে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাগলের মতো সবদিক চেয়ে দেখলাম, ধূলোর উপর আমার ছাড়া কারো পায়ের ছাপ পর্যন্ত নেই। এতক্ষণে আমার প্রাণে ভয় ঢুকল, আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গয়না যেমন তেমনই পড়ে রইল, কোনও রকমে দরজার আগল খুলে ছুটে জল-ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বাবু, এই নিন বাকি গয়নাগুলো, আর আমাকে আরও চার-পাঁচজন দুষ্টলোকের সঙ্গে এক ঘরে বন্ধ করে রাখুন।

ট্যাপার অভিজ্ঞতা

অনেক দিন আগের ঘটনা, লিখেওছিলাম এ বিষয়ে সে সময়ে, তবে তার কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। সত্যি না বানানো যদি জানতে চান তাহলে বলি, যে গল্প শুনবে তার অত খবরে কি দরকার? তার কাছে যে ঘটনা বানানো আর যে ঘটনা কোন কালে চুকে-বুকে গেছে, তাতে কি তফাত? ব্যাপারটা শুনুন তো আগে।

আজকের আধ-বুড়োদেরো নিশ্চয় মনে আছে যে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে সবাই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে নানান্ অস্বাস্থ্যকর আর বিপদসঙ্কুল জায়গায় গিয়ে নিরাপত্তা খুঁজেছিল। সেই সময়ে আমার এক খুড়োর বাড়ির সকলে ঠিক করলেন মাস ৬-৭ -এর জন্য কার্সিয়াং গেলে ভালো হয়। সেখানে একটা ছোট বাড়ী খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। স্বাস্থ্যকর জায়গা; সমৎকার দৃশ্যাবলী। তা বড় পিসিমা কিছুতেই অ-দেখা বাড়িতে যাবেন না, তাই তাঁর নাতি ট্যাপাকে পাঠানো হল একবার সে দেখে আসবে।

ট্যাপাকে পায় কে! ছোট একটা স্যুটকেসে গরম কাপড়-চোপড় আর একটা মোটা কম্বল পুরে সে তো রওনা দিল। বড় বাজারে মালিকের অফিস থেকে চাবি নিতে গিয়ে শুনল, চাবির দরকার নেই, বাড়ি খোলা, তোষক বালিশ মায় বাসনপত্র সব আছে। বললেই চৌকিদার সব খুলে দেবে, তাকে পোস্টকার্ড দেওয়া হয়েছে।

বেলা দশটা নাগাদ ট্রেন থেকে নেমে স্যুটকেসটা কাঁধে করে ডাও-হিল্ রোড দিয়ে ট্যাপা চলল। চমৎকার জায়গা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে পথ উঠেছে, বাঁকে বাঁকে খুদে দোকান, সেখান

পান বিড়ি দেশলাই কেরোসিন চাল ডাল আলু নুন সব পাওয়া যায়।

অর্ধেক পথ উঠে ডান হাতে ছোট্ট রাস্তা বেরিয়েছে। একটা মোড় নিয়েই ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। এ অঞ্চলে ঐ একটাই বাড়ি। লাল টিনের ছাদ, সবুজ দরজা-জানলা। লাল রঙের কাঠের গেট। সেটি ক্যাঁচ করে খুলে ভেতরে গিয়ে ট্যাঁপা "চৌকিদার! চৌকিদার!" করে মেলা হাঁকডাক করেও যখন সাড়া পেল না, তখন নিজেই সামনের কাচের দরজাটি ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

লম্বা হল্‌-ঘর, নারকেলের ছোবড়ার ম্যাটিং পাতা। সোফা চেয়ার টেবিল, মায় ছাতা-টুপি রাখার একটা আয়না দেওয়া র‍্যাক্ পর্যন্ত রয়েছে। শোবার ঘরের সুইচ্ টিপে দেখল আলো জ্বলছে, চানের ঘরের কল খুলতেই জল এল। খাসা বাড়ি। এখানে ৬-৭ মাস আরামে কাটানো যাবে। কাল সকালেই ফিরে যাবে। সঙ্গে দু'বেলার জন্য প্রচুর খাবার।

ঠিক সেই সময় চারদিক ঝেঁপে বৃষ্টি এল। পাহাড়ে যেমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশায় আকাশ, পাহাড়, উপত্যকা সব লেপেপুঁছে একাকার হয়ে গেল। দিন না রাত কারো বুঝবার জো রইল না। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে ট্যাঁপা দেখে এক রোগা ফিরিঙ্গি বুড়ো, হাতে একটা ছোট ব্রীফ্-কেস্, ভিজে চুপ্পুড়। কোথায় আছাড় খেয়েছে, প্যাণ্টের হাঁটুতে শ্যাওলা আর কাদা লাগা, গাল-বসা ফ্যাকাশে মুখ। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত-কপাটি লাগছে।

সাহেব বলল, "ভিতরে আসতে পারি কি?" ট্যাঁপা বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, এমন দিনে কেউ কুকুর-বেড়ালকে ফিরিয়ে দেয় না। এসো, ভিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমার গরম পাজামা-সুট পর। চা আছে, খাও।"

শোবার ঘরের দু'টি খাটে বিছানা পাতা, একটি করে কম্বল। সাহেব চা খেয়ে বিছানায় ঢুকবার আগে ব্রীফ্ কেস্ খুলে রাশি রাশি একশো টাকার নোট বের করে ম্যাটিং-এর উপর শুকাতে দিল। দুটো কম্বলেও তার শীত যায় না দেখে, ট্যাঁপা তার সাধের গরম জলের ব্যাগটি পর্যন্ত তার পায়ের কাছে ঠুসে দিল।

তারপর খাবারদাবার খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে, নিজেও অন্য খাটে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। তিন দিন ছিল প্রবল বৃষ্টি। খাবারদাবার শেষ। রান্নাঘরে পুরনো প্রাইমাস স্টোভ ছিল, ছেঁড়া একটা ছাতাও ছিল। ট্যাঁপা মোড়ের দোকান থেকে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তেল এনে, স্টোভ ধরাতে গিয়ে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় আর কি! ছাদ অবধি আগুন উঠল। সাহেব দৌড়ে এসে, তারি মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কলটা খুলে, আগুন কমাল। বড় ভালো মানুষটা। জ্বর গা, কিছু খেল না, শুধু চা আর কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক। নোটগুলো সম্বন্ধে বলল-ও না কিছু। শুকোলে আবার ব্রীফ্ কেসে ভরে রাখল। তৃতীয় দিন সকালে রোদ এসে ঘর ভরে দিল, আকাশ ঘন নীল, মেঘের চিহ্ন নেই। ট্যাঁপা তার জিনিসপত্র গুছিয়ে সায়েবের কাছে বিদায় নিয়ে, স্টেশনের দিকে চলে গেল। বলা বাহুল্য কলকাতায় ফিরে শুনল তার দেরি দেখে ইতিমধ্যে ঘাটশীলা যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। জিনিসপত্র নিয়ে বড় পিসিমারা আগের দিন রওনা হয়েও গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এর পর ১৫ বছর কেটে গেল। ট্যাঁপা তখন দস্তুরমতো সংসারী। হঠাৎ এক পূজোর ছুটিতে কার্সিয়াং যাবে ঠিক করল। খুব সহজেই সেই বাড়িটিই পাওয়া গেল। এবার ট্যাঁপা নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগে গেল বাড়ির অবস্থা দেখে আসতে। এবার সঙ্গের স্যুটকেস স্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে, খালি হাতে বাড়ি দেখতে গেল। সেদিন বিকেলেই ফেরার ইচ্ছে।

সেই বাড়ি ; সেই একটু ঝুলে-পড়া পাকা গেট ক্যাঁচ্ করে খুলে গেল। সেদিন-ও চৌকিদার এল না ; কিন্তু সদর দরজা খুলে গেল ; আলো জ্বলল, কলে জল এল। আর সেই ১৫ বছর আগের মতো চারদিক অন্ধকার করে, আকাশ পাহাড় উপত্যকা লেপেপুঁছে বৃষ্টি নামল।

তারি মধ্যে সদর দরজায় কে ধাক্কা দিল, মনে হল ঘড়ির কাঁটা ১৫ বছর ফিরে গেছে। দরজা খুলেই ট্যাঁপা দেখল এক রোগা ফিরিঙ্গি বুড়ো, হাতে ছোট ব্রীফ্-কেস্, ভিজে চুপ্পুড়। কোথায় অছোড় খেয়েছে, প্যাণ্টের হাঁটুতে শ্যাওলা আর কাদা। ঠক-ঠক করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত-কপাটি লাগছে। গাল-বসা ফ্যাকাসে মুখ।

সাহেব বলল, "ভিতরে আসতে পারি কি?" ট্যাঁপা দরজাটা হাঁ করে খুলে দিয়ে, সাহেবের পাশ কাটিয়ে, সেই জল-ঝড় মাথায় করে, এলো-পাথাড়ি পাহাড়ের পথ ধরে স্টেশনের দিকে ছুট দিল। ফিরেও দেখল না সাহেব কি করছে।

ভয়

ছাপাখানাটি খুব ছোট হলেও সারাদিন সেখানে কাজ হত। ছুটি হতে হতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যেত। ছাপাখানার পাশে একটা চায়ের দোকান ছিল। কুড়ি পয়সা দিলে এক ভাঁড় গুড়ের চা আর ঝালঝাল আলু-চচ্চড়ি দিয়ে মোটা একটা হাতরুটি পাওয়া যেত। খেয়েই বঙ্কু রওনা দিত। দুটো বাড়ি, তারপরেই বন। এ-সব জায়গায় কোথায় শহর শেষ হয়ে বন শুরু হল বলা মুস্কিল। শহর বলতে অবিশ্যি খুবই ছোট শহর। গ্রামও বলা চলে। তবে ছাপাখানায় অনেক বাইরের লোক কাজ করত। তারা ঐ গ্রামেই থাকত। গ্রাম বললে চটে যেত, বলত ছোট শহর।

বনের মধ্যে শালগাছই বেশি। মাঝে মাঝে পলাশ, মহুয়া, শিমুল, বুনো তাল। দিনের বেলায় চমৎকার। সন্ধ্যে হলেই মুসকিল। ছায়া-ছায়া; অদ্ভুত সব শব্দ। গুরু-শিষ্য প্যাঁচা ডাকে। বনের নাম ঘনার বাদা। এককালে এখানেই কুখ্যাত ঘনা-ডাকাতের আস্তানা ছিল। সে প্রায় একশো বছর আগে। তখন কি দিনে কি রাতে, কেউ পারলে এ-বনের ধারে-কাছে আসত না।

রাতে এখনো আসে না। দিনে মধু আর আঠা নিতে এলেও, রাতে আসে না। ঘনা নাকি এখনো ডাকাতি ছাড়ে নি। অনেকে নাকি দূর থেকে তাকে দেখে অমনি চোঁ-চোঁ দৌড় দেয়।

বঙ্কুর নাইট-স্কুলটা বনের ওপারে। লেখা-পড়া শিখতে হলে কষ্ট করতে হয়। বাবার ডান পা কাটা গেছে, পেনশন যা পায় তাতে ওদের চলে না। তাই বঙ্কুকে ওদের হাইস্কুল ছেড়ে, এই নাইট স্কুলে পড়তে যেতে হয়। অন্য দিন সঙ্গে লখা থাকে। ওর বন্ধু

লখাও ছাপাখানায় কাজ করে। দুজনে থাকলে ভয় করে না। ঘনা একা, লোক খোঁজে।

তখনো আলো ছিল। হয়তো ছ'টা বেজেছিল। শাল গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল। পাখি ডাকছিল। ঝোপে-ঝাড়ে খুস্-খুস্ খর-খর। বঙ্কু আধ ঘণ্টার মধ্যে বন পার হয়ে, বন-বিভাগের আপিসের গায়ে লাগা নাইট-স্কুলে পৌঁছে গেল।

বঙ্কুর বয়স চোদ্দ। আর তিন বছরে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে, ছাপাখানার কাজ শেখার স্কুলে ভরতি হবে। পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হবে, আবার রোজ পাঁচ ঘণ্টা কাজ করার জন্য মাইনেও পাবে। আরো তিন বছর পরে পাস করে বেরুলে সরকারী কাজ পেয়ে যাবে। মা-বাবা সেই আশাতেই আছেন। ছোট বোন নুটুও বলে, "দাদা আমাকে বড় পুতুল কিনে দেবে।"

তাই মন দিয়ে পড়ে বঙ্কু। পড়তে পড়তে ভাবে এরপর আবার বন পার হতে হবে। একা। এক সময়ে ছুটি হয়ে গেল। তখন রাত ন'টা। বঙ্কু আজ একা বনের পথ ধরল। সঙ্গে আলো ছিল না। আলো কোথায় পাবে, টর্চের বড্ড দাম। একটা বটগাছের কোটরে লখা কয়েকটা শুকনো বাঁশের আগা ছেঁচে শুকনো পাতা জড়িয়ে মশাল বানিয়ে, লুকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কু সেই একটা বের করে শহরের শেষ পান-বিড়ির দোকান থেকে ধরিয়ে নিল।

জগাদা বলল, "একা যাচ্ছিস্ নাকি? আজ আবার অমাবস্যা। লখা কোথায়?" "লখার জ্বর।" "না হয় আমার এখানে চাট্টি খেয়ে শুয়ে রইলি। সকালে বাড়ি যাস্।"

"মা-বাবা ভাববে, জগাদা।"

মশাল ধরিয়ে বঙ্কু রওনা হল।

মশালে যেমন আলো-ও হয়, তেমনি আবার মনে হয় চারদিকে গাছের ছায়াগুলো নড়ছে-চড়ছে। বঙ্কু পা চালিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ শুনল ছোট ছেলের কান্না। বঙ্কুর গায়ের রক্ত হিম। ও নিশ্চয় সত্যিকার ছোট ছেলের কান্না নয়, অন্য কিছুতে ওকে ভোলাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করছে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল বঙ্কু। ছোট ছেলেটার কান্না থামল না। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, আবার ফোঁপাতে থাকে। নুটু আগে ঐ রকম করে কাঁদত।

বঙ্কু মশাল নিয়ে চারিদিক খুঁজতে লাগল। জায়গাটা বড্ড ঘুপ্‌সি। তার মধ্যে বেদেরা খরগোস ধরবার ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কামড়ানো ফাঁদ। গোটা দুই খরগোশ পড়েছিল আর একটা ছোট ছেলে। কাঠুরেদের ছেলে কিনা কে জানে। এ জায়গা ভালো না। এখান থেকেই চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু ছেলেটার মুখে আলো পড়তেই, বঙ্কু দেখল তার চোখের কোণে জল জমেছে, ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো বছর তিনেক বয়স। বঙ্কু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফাঁদের কাটা কাটা দাঁতগুলো তার একটা পায়ে কামড়ে বসেছিল। সঙ্গে একটা সবুজ ডালেও কামড় পড়েছিল বলে পা-টা কেটে পড়ে যায় নি।

হঠাৎ কানের কাছে ফোঁশ্‌ শব্দ শুনে দেখে কুচকুচে কালো একটা লোক, কপালে কাটার দাগ, লাল লাল চোখ, উঁচু উঁচু দাঁত, বিকট চেহারা। কিন্তু লোকটা নরম গলায় বলল, "টেনে খুলো না, বাপু, পা কাটা যাবে। দাঁতের ফাঁকে ঐ পাথরটা গোঁজ।" মশালটা পাথরে ঠেকা দিয়ে, ছোট একটা অসমান ঢিল নিয়ে আস্তে আস্তে ফাঁদের দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিতেই, ফাঁদের হাঁ বড় হল। বঙ্কু ছেলের ঠ্যাংটা টেনে বের করে আনল। ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। বঙ্কুর হাত পা ঠাণ্ডা।

কালো বিকট লোকটা বলল, "না, না, কিছু হয়নি। ব্যথার চোটে অচৈতন্যি হল। ঐ যে তোমার ডান হাতে ছোট ছোট পাতা

দেখছ, ঐ খানিকটা পাথরে ঘষে লাগিয়ে দাও। দেখতে দেখতে ঘা সেরে যাবে।”

তাই করল বঙ্কু। লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল। তারপর ছেলেটাকে কোলে করে উঠতেই, লোকটা বলল, “আমার পা-টা কেউ বাঁচায়নি গো, আঙ্গুলগুলো সব কাটা পড়েছিল।” ওর পায়ের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল বঙ্কু। ডান পায়ে একটাও আঙ্গুল নেই।

এমন সময় দূরে মশালের আলো দেখা গেল আর ডাক শোনা গেল, নাকু-উ-উ-উ। হারে নাকু-রে-এ-এ! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেহারার লোকটা কোথায় যে সরে পড়ল, তার ঠিক নেই। ছেলেটাকে খুঁজতে এসেছে গাঁয়ের লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে এসেও পড়ল। পাগলের মতো চেহারা ঐ বোধ হয় ছেলের মা। বঙ্কুর কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বারবার সে বলতে লাগল, “বাঁচি থাক্, সুখী হ, ভগবান তোর ভালো করুক।”

কাঠুরেদের ছেলেটা নাকি ভারি-দুরন্ত! কেমন করে দল-ছাড়া হয়ে গেছিল। তারপর হাসতে হাসতে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরল ছেলের বাপ হঠাৎ বলল, “বড় বাঁচিয়েছিস্, বাপ্, খনার হাতে পড়লে উকে আর দেখতে পেতাম না। খনা বড় ভয়ঙ্কর!”

বঙ্কু বলল, “কেমন দেখতে খনা?”

“কি জানি! কাছে গেলে তো নিঘ্যাত মিত্যু! শুনেছি কালো কুচকুচে, কপাল কাটা আর ডান পায়ে একটাও আঙ্গুল নেই। বড় ভয়ঙ্কর সে।”

বঙ্কুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

সে বল্ল, “না, না, খনা বড় ভালো, মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।”

এরপর নাকি খনাকে আর কেউ কখনো দেখেনি।

———

দিলীপ ভট্টাচার্য্য (অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী)

সারাণ্ডার জঙ্গলে

চিত্ত দাস

সাপের কথা ও কাহিনী

দিলীপ ভট্টাচার্য্য

চিতার কাহিনী

সুমথনাথ ঘোষ

পূর্ববঙ্গের উপকথা

অমিয়কুমার পাল

কিংবদন্তী দেব দেউল

ধীরেন্দ্রলাল ধর

মেঘনার মোহনায়